প্রাতঃস্মরণীয়া

মা যোগমায়া

নারায়ণী দেবী

শ্রীমতী দীপালী দেবী

প্রকাশিকা—শ্রীমতী দীপালী দেবী
৫৪/ সি, কাইজার স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা—ডাঃ স্বদেশ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

(১) আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ও তদন্তর্গত শাখাশ্রম
(২) শ্রীশ্রীনিগমানন্দ আসন মন্দির সাঁতরাপুর রোড
ভুবনেশ্বর—২
(৩) মহেশ লাইব্রেরী ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা—১৩

মুদ্রণে জয়ন্ত প্রিণ্টার্স—শ্রীমতী অর্চনা ঘোষ
৯এ, হরিপাল লেন কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণে—এস, জি, প্রসেস্
৩৪, জাষ্টিস মন্মথ মুখার্জি রোড
কলিকাতা—৯



প্রাতঃ স্মরণীয়া মা যোগমায়া

প্রকাশন কথা

নিগমানন্দ আর্য্য-দর্পণে 'প্রাতঃস্মরণীয়া' নামাবরণে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের মঠাধীশ্বরী জগদম্বা স্বরূপা যোগমায়াদেবীর পূতঃ জীবন চরিত আলোচনা করেছেন বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত শ্রদ্ধেয়া নারায়ণীদেবী। এই জীবন কথা আলোচনার অবকাশে নারায়ণীদেবী যোগমায়াদেবীর ঠাকুরসেবা, ঠাকুরের প্রতি নিষ্ঠা এবং অটল বিশ্বাসের কথা যেমন বলেছেন তেমনি বলেছেন তাঁর সাধনালব্ধ দেবীমহিমার কথা।

ঠাকুর ছিলেন বৈদিক সন্ন্যাসী, পরমহংসত্ব লাভ করে ত্রিগুণাতীত ভূমিতে অবস্থান করলেও লোকশিক্ষার প্রয়োজনে যথাসম্ভব বর্ণাশ্রম বিধি মেনে চলতেন। তাই শাস্ত্রমূর্ত্তি ঠাকুর মহারাজ বৈদিক অনুশাসন মেনে হেমলতা মাকে সন্ন্যাস দিতে দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। কিন্তু সকল দ্বিধার অবসান ঘটিযে তাঁর 'পরমাসিদ্ধি মাহেশ্বরী'র অনুরোধেই হেমলতামাকে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের পৌষ অমাবস্যায় 'অবধুতী সন্ন্যাস' দিলেন। স্বরূপ নামাকরণ করলেন 'যোগমায়া', কিনা—ভগবানের মায়াশক্তি। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন হেমলতা মায়ের আধারাবলম্বনে স্বয়ং জগদীশ্বরীকে।

ঠাকুর নিগমানন্দদেব নৈর্ব্যক্তিক গুরু সত্বায় বৃংখিত। দেহাশ্রয়ী হয়েও গুরুব্রহ্ম-ভাগবতীতনু। ভগবানের মায়াশক্তি যোগমায়া সেই অমূর্ত্ত গুরুব্রহ্মের মূর্ত্ত রূপ নরাকার পরব্রহ্ম শ্রীনিগমানন্দদেবের যেমন শরণাগতা তেমনি আবার তাঁর ভাগবতীতনুর পরিপোষণকারী। গুরুব্রহ্মের মায়াশক্তি—তিনি বিশ্বের জননী। তাই যোগমায়ার কৃপা কটাক্ষ ভিন্ন সদগুরু নিগমানন্দ দেবের শরণাগতদের মুক্তি অকল্পনীয়। "সৈষ প্রসন্না বরদাং নৃনাং ভবন্তি মুক্তয়ে"—তিনি প্রসন্ন না হলে মুক্তিমার্গ উদ্ঘাটিত হয় না। যোগমায়া সমাবৃত হয়েই ঠাকুর নিগমানন্দদেবের গুরু-শিষ্য লীলাভিনয়।

ঠাকুর তো যোগমায়াদেবীকে মানবী দেখতেন না, তিনি সদা সর্ব্বদা যোগমায়াদেবীর আধারাবলম্বনে স্বয়ং মাহেশ্বরীকেই প্রত্যক্ষ করতেন। তাই লোকবিচারে তাঁর চেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠা যোগমায়াদেবীর সেবা-পরিচর্য্যা নিতে দ্বিধা করতেন না।

যোগমায়াদেবীর অকৃত্রিম সেবায় মুগ্ধ হয়েই নরাকার পরব্রহ্ম ঠাকুর নিগমানন্দদেব একদা জনৈক মহিলা ভক্তকে 'মায়ের চোখে ঠাকুরকে দেখতে' উপমা স্বরূপ যোগমায়াদেবীর কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন-"যো-র নিজের কিছু নাই, তার সবই ঠাকুর, সুতরাং ঠাকুরকে ভালবাসিয়া কেহ যদি

তাহাকে পদাঘাত করে, তবু সে তাহার আপন, আর ঠাকুরকে ছাড়িয়া কেহ তাহাকে শত আদর করিলেও সে তাহার কেহই নহে। যে এখনও ঠাকুরকে ষোলআনা না বুঝিয়াছে তাহার নিকট প্রাণের কথা খোলা প্রগল্ভতা প্রকাশ বলিয়া তাহার জ্ঞান হইযাছে। (ঠাঃ চিঃ ২য় খণ্ড ৪২ নং)

বস্তুতঃ যোগমায়াদেবীর ঠাকুরসেবার মূলে ছিল এক 'ভাগবতী চেতনা' ছিল 'দরদী প্রাণের স্পর্শ'। তাঁর ভাবনায় "ঠাকুর তো ঠাকুরই, তিনি তো আর মানুষ নন্। তেমনি শুদ্ধাচারে তাঁর সেবা চাই"। নারায়ণীদেবী লিখেছেন—"এর ফলে পরে যাঁরা ঠাকুরের সেবাধিকার পেয়েছেন ; সেই ভুবন, হরিদাস, নীলমনি, জিতেনদাদারা এবং সুরমা (সুরবালাদেবী) ও প্রাচীন সন্ন্যাসীরা সকলেই ঠাকুর সেবায় অতি সদাচারী ও বিচারশীল ছিলেন। এই শিক্ষা ভৈরবী মাযেরই শেখানো।"

নারায়ণীদেবী যাঁদের নামোল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে ভুবনানন্দ সরস্বতী মহারাজজী ও সুরবালাদেবীর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। হরিদাস ব্রহ্মচারীর ঠাকুর সেবার কাহিনী জেনেছি নারায়ণীদেবীর লিখিত নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ গ্রন্থে। নীলমণি ও জীতেন দাদার ঠাকুর সেবার কথা অন্য কেউ বলেছেন এমন কথা আমার জানা নেই। ভৈরবী মাযের শিক্ষায় শিক্ষিত ঠাকুরের এই সব সেবক-সেবিকাগণ আমাদের কাছে ঠাকুরসেবার পথিকৃৎ। এঁদের কথা আলোচনায় ঠাকুরের কথাই আলোচিত হয়। ঠাকুর ভিন্ন এঁদের পৃথক সত্ত্বা নাই। সেবা করা—সে তো আদেশ প্রতিপালন করা নয়, সেবা অর্থে নিজের স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে 'তদাত্মতা' লাভ করা। সেব্য'র ভাবনায় সর্বদা ভাবিত থাকা। তাই সেবাধিকার সবাই পায়না এ জানা কথা। এই রকম 'তদ্ভাবে' ভাবিত সেবাকেই কি ঠাকুর 'ব্রহ্মবিদ্‌গুরুর সেবা' আর শাস্ত্রানুমোদিত 'কঠোর সন্ন্যাস যোগ অবলম্বন' এক পর্য্যায় ভুক্ত করেছেন ?

ভুবনানন্দজী আমায় ঠাকুর পরিচয় করিয়েছেন, ঠাকুরের কাছে 'বিড়াল ছানার' মত আত্মসমর্পনের কৌশল শিখিয়েছেন। স্বভাবতঃই তিনি আমার খুবই পরিচিত। তাঁর ঠাকুর সেবার কথা নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ, শ্রীশ্রীনিগমানন্দস্মৃতি, শ্রীশ্রীনিগমানন্দ কথামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে এবং আর্য্য দর্পণ পত্রিকায় যত পড়েছি, তারচেয়েও প্রাচীন শিষ্যভক্তদের মুখে তাঁর ঠাকুরসেবার কথা এবং তাঁর বাচনিক ঠাকুরের অপ্রাকৃত লীলা কথা শুনেছি অনেক বেশী। যার বিস্তৃত বিবরণের এখানে স্থানাভাব, তবুও যত কথা ইতস্ততঃ লিপিবদ্ধ

আছে তার সার সংগ্রহ করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাবে যে ভুবনানন্দজী ছিলেন ঠাকুরের খুবই অন্তরঙ্গ ও প্রিয়তম।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত আলিপুরদুয়ারের শিবদয়াল পাল এবং স্কুলের নরেশচন্দ্র পাকড়াশীর কাছে ভুবন ও হরিদাস ব্রহ্মচারীর সেবা প্রসঙ্গে "ভুবনের সেবা যেমন সন্তানের প্রতি পিতার সেবা, হরিদাসের সেবা যেমন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সেবা" শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উক্তিটি শুনেছিলাম। ১৩২৮ সনের পৌষ মাসের আর্য্য-দর্পণে 'ভুবনানন্দ স্মরণে' প্রবন্ধে সিদ্ধানন্দজীও এই রকম কথার উল্লেখ করেছেন, "ঠাকুরও যেন অবোধ বালকের মত ভুবনের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন—নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ভার তাঁহার উপর ছাড়িয়া দিয়া। যখনই বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হইত তখনই ভুবনের ডাক পড়িত তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য। ভুবন সঙ্গে থাকিলে ঠাকুর নিশ্চিন্ত—পিতার সঙ্গ পাইয়া বালক যেমন নিশ্চিন্ত হয়।"

এখানে একটি কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না—হরিদাস ও সুধীর ১৭।১৮ বৎসরের দুইটি ছেলে একত্রেই ঘর ছেড়েছিলেন 'সত্য' লাভের জন্য। সুধীর নামের পরিবর্ত্তন করে 'ভুবন' (ঠাকুরের পিতার নাম) নামাকরণ করেন ঠাকুর স্বয়ং। বিদ্বানব্রাত্য শ্রীনিগমানন্দদেবের তুষ্টিবিধান করেই তাঁদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি, তাঁদের সত্য লাভ ঘটেছে।

ঠাকুরের সেবিকাদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয়া যোগমায়াদেবীর পরেই যাঁর স্থান তিনি সুরবালামা। তাঁকে আমি জানি ঠাকুরের শেষ জীবিতা সন্ন্যাসীনি শিষ্যা 'নিস্ত্রৈগুণ্যের' সাধিকা বলে। ঠাকুরের মানস কন্যা নারায়ণীদেবীর পালিকা মাতা তিনি। ঠাকুর যখন মর্ত্ত্যলোকের লীলা সংবরণ করেন তখন নারায়ণীদেবী মাত্র ১০ বৎসরের বালিকা। নারায়ণীদেবী সেই বালিকা বয়স হতে আমৃত্যু যে ভাবে তাঁর সাহচর্য্যে ঠাকুরের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তার ফলশ্রুতিই ঠাকুর নিগমানন্দদেব প্রসঙ্গে নারায়ণীদেবীর এত কথা। ১৩২৮ সন হতে ১৩৪২ সন পর্যন্ত নীলাচল কুটীরে থাকাকালীন ঠাকুর তাঁর স্থূলদেহটী রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন এই সুরবালা মাকেই। স্পর্শমণির স্পর্শগুণে সুরবালামা আজ আমার দৃষ্টিতে 'নিখাদ সোনা'।

নরাকার পরব্রহ্ম ঠাকুর নিগমানন্দদেবের ভাগবতীতনুর শুচিশুদ্ধ পরিপোষণে যাঁরা ভৈরবীমায়ের কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন, সেই সব প্রাতঃস্মরণীয় সেবক-সেবিকাদের স্মৃতিচারণের সুযোগে আমি কৃত কৃতার্থ।

এই পুস্তকে ঠাকুরের সেই সব সেবক-সেবিকাদের কয়েক জনের এবং ভৈরবীমায়ের দুষ্প্রাপ্য প্রতিকৃতি শ্রীমতী কাঞ্চন লতা মহাপাত্র, শ্রীমতী হেমলতা মহাপাত্র, শ্রীমৎ বিমল চৈতন্য ব্রহ্মচারী এবং আমার দিদি শ্রীমতী শেফালী দেবী প্রভৃতির আনুকুল্যে সংযোজন সম্ভব হল।

একদা মঠের ভাণ্ডারী মায়ের সহকারী ঠাকুরগত প্রাণ শ্রীগুরুদাস সেন দাদা 'সূচনামুখ' ও অধ্যাপক বীরেন্দ্র কুমার চৌধুরী দাদা 'স্মরণীয়া অবিস্মরণীয়া' লিখে দিয়ে পুস্তকটিকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন। স্বামী অমলানন্দ মহারাজ এবং অধ্যাপক বীরেন্দ্র কুমার চৌধুরী দাদার মনে বড় আশা—আজ থেকে অনেকদিনপরে একদিন ঠাকুর নিগমানন্দদেবের জীবন চরিত্র গবেষণার বিষয় হয়ে উঠবে—তখন ঐতিহাসিক দলিলের অভাবে ঠাকুর নিগমানন্দদেবের বিকৃত ইতিহাস ভবিষ্যত প্রজন্মের অবলম্বন না হয়, তাই এঁরা ঠাকুর সম্বন্ধীয় নারায়ণীদেবীর ইতিহাস ভিত্তিক প্রবন্ধগুলি সঙ্কলন করে প্রকাশে আমাদের পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করেন। পুস্তক প্রকাশে শ্রীমৎ ফণী ব্রহ্মচারী যে ক্লেশ স্বীকার করেছেন কৃতজ্ঞ চিত্তে সে কথা স্মরণ করি।

ঠাকুরের শিষ্যা-সন্ন্যাসিনী ভুবনেশ্বর-মহিলাসংঘ এবং কুমারীসংঘের সভানেত্রী 'দিব্যো দুহিতা' সুরবালাদেবী ও নারায়ণী ট্রাস্ট সানন্দে নারায়ণী দেবীর প্রাতঃস্মরণীয়া প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুমতিদান করেন এবং এই পুস্তকের গ্রন্থলভ্যাংশ ত্রিভুবনেশ্বরী মায়ের মানুষীতনু নলিনীজায়া সুধাংশুদেবীর জন্মশত বর্ষের অন্তিমলগ্নে নারায়ণীদেবীর পক্ষে গুরুধামের সেবায় অঞ্জলি প্রদানের অনুমতিও দান করেন।

এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নাই, আছে শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে এঁদের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল প্রার্থনায় আমার অশ্রুজল। জয়গুরু

বিদ্যানব্রাত্য শ্রীশ্রীনিগমানন্দ চরণাশ্রিতা

দীপালী দেবী।

সূচনামুখ

শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দদেবের মানসী কন্যা নারায়ণীদেবী লিখিত এবং নিগমানন্দ আর্য্য-দর্পণে প্রকাশিত সঙ্ঘাধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীভৈরবী যোগমায়া দেবীর জীবনী আমাদের গুরুভগ্নি পরম স্নেহভাজনা দীপালীদেবী পুস্তকাকারে প্রকাশিত করে আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। এরফলে শ্রীশ্রীভৈরবী মা সম্বন্ধে সঙ্ঘসেবীদের প্রাণে যে অজ্ঞাত অপরিচিতির অভাব ছিল তা নিরশন হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের অসামান্য ত্যাগ বৈরাগ্য, শ্রীশ্রীগুরুভক্তি ও সন্তান বাৎসল্যের পরিচয় নিগম সন্তানগণ অনুভব করবেন। তিনি আমাকে ভৈরবীমা সম্পর্কে কিছু লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন, তাই এই অশীতি বয়সোত্তীর্ণ কালে এই অযোগ্য ব্যক্তিকে কলম ধরতে হল।

স্রষ্টা, সৃষ্টি ও তদনুবর্ত্তী জীব যেমন একই সূত্রে গ্রথিত, মঠাধিষ্ঠাতৃ মা, শ্রীশ্রীঠাকুর এবং মঠান্তেবাসীদের প্রাণও ছিল তেমনই ভাবে জড়িত।

শ্রীশ্রীঠাকুর জীবনের অন্তপর্বে একান্ত নির্জ্জনবাসী হয়ে জগদ্ধিত কল্যাণ কামনা ও গুরুশক্তি সঞ্চারের ক্ষেত্ররূপে পারাবার তীরবর্ত্তী জগন্নাথ ক্ষেত্রকেই বেছে নিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাধন্যা ভৈরবীমা ছিলেন মঠে, তাঁর সস্নেহ ও সতর্ক দৃষ্টির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের মঠে উপস্থিতি অভাব অন্তেবাসীদের প্রাণে খুব বেশী হত না। মায়ের অসীম স্নেহের আকর্ষণে অন্তেবাসীদের সব অভাব ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপ্রাকৃত ভাব ফুটে উঠেছিল সঙ্ঘজননী ভৈরবী মায়ের মধ্যে। ঠাকুরই ধ্যান, ঠাকুরই জ্ঞান—দেহ-মন-প্রাণ তদ্ভাবে রূপায়িত করে ঠাকুরের সেবা করাই ছিল যেমন তাঁর জীবন সাধনা, তদ্রূপ শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তে গড়া মঠ ও ঠাকুরগত প্রাণ মঠান্তেবাসী সন্তানদের প্রতি অশেষ স্নেহ-ভালবাসাই ছিল তাঁর ঠাকুরসেবা। শ্রীশ্রীঠাকুর, মঠ এবং মঠাধিষ্ঠাতৃ ভৈরবীমায়ের সান্নিধ্য লাভ আমার জীবনে হয়েছিল। তাই ভৈরবী মায়ের সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরছি।

পুরুলিয়া জেলার[1] আদ্রার সন্নিকট মুরাডি গ্রামে আমার জন্ম। পঞ্চদশ বয়ঃক্রমে দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হই। সপ্তদশ বয়ঃকালে যোগীগুরু প্রেমিক গুরু গ্রন্থ পাঠ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হই। যাত্রা করি মঠের উদ্দেশ্যে। সঙ্গী ছিলেন একই গ্রামের বাল্যবন্ধু শক্তি। যিনি বর্ত্তমানে স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী নামে সুপরিচিত। উভয়ে একই সঙ্গে মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর সান্নিধ্যে উপস্থিত হই। সেবার শুধু তাঁর করুণাদৃষ্টি টুকু লাভ

করি। মাত্র আটদিন পরে মঠ থেকে আত্মীয়-স্বজনরা উভয়কেই ফিরিয়ে নিযে আসেন। তার দুইবৎসর পর আবার পুরীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ সান্নিধ্যে উপস্থিত হই। আমি দীক্ষা লাভের আগ্রহ নিবেদন করায় স্নেহ মধুর কণ্ঠে বললেন-'যারা আমায় ভালবাসে তারা তো আমার দীক্ষিতই— তোমাদের আবার দীক্ষা কি? যাও এখন পড়াশোনা করগে, সময় মত দীক্ষা দেব।' বাড়ী ফেরার ট্রেন ভাড়াটিও হরিদাস ব্রহ্মচারীকে দিতে আদেশ দিয়ে তিনি সস্নেহে আমাকে বিদায় করলেন। কিন্তু ছয় মাস পর ঠাকুরকে আবার আমার ব্যাকুলতা প্রকাশ করায়, তিনি বাঁকুড়াতে আমায় দীক্ষা দিলেন একটি মাত্র হরিতকীর বিনিময়ে। এই ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন স্পর্শণ ও দীক্ষা লাভ করেও প্রাণের পিপাসা, রিক্ততা ও শূন্যতা বোধে দিশাহারা হয়ে ঠাকুরকে সব জানাই এবং তাঁর সম্মতিক্রমে মঠে অন্তেবাসী হয়ে যোগদান করি। শ্রীগুরুর অশেষ কৃপা, অনুকূল পরিবেশ, সাধ্বী পত্নীর সহায়তা ও সাহায্যই আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ প্রান্তে মঠে থাকার সৌভাগ্য এনে দিয়েছিল।

অন্তেবাসী হওয়ার প্রথম ২।৩ বৎসর গোচারণ, কৃষি কাজ, মুদ্রণ যন্ত্রে কালি দেওয়া প্রভৃতি কর্ম্ম সমাপনান্তে মঠে ভাণ্ডারের কর্ত্তৃত্ব আমার ওপর দেওয়া হয়। তৎকালে মঠে ২৫।২৬ জন অন্তেবাসী এবং বহিরাগত অতিথি-অভ্যাগতের আহার্য্যের ব্যবস্থার ভার ভাণ্ডারীর উপরই ন্যস্ত থাকত। উৎসবকালে সময়োপযোগী ফল-মূলাদি নানা উপকরণ দিয়ে বাল্যভোগ দেওয়া হ'ত। ফল-মূলাদি এমন ভাবে কাটতে হ'ত যেন ফলের উপরের খোসা-বীজ-শিরা কিছুই না থাকে। এমন কি ভেজান মুগ বা ছোলার খোসাও থাকবে না। বঁটিতে পা দেওয়া চলবে না—জানুতে চেপে রেখে কাটতে হত। দ্বিপ্রহরে নানা উপকরণে হ'ত মধ্যাহ্ন ভোগ। সব দায়িত্বই থাকত ভাণ্ডারীর উপর। সর্ব্বোপরি থাকত মায়ের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি— যেন কোথাও ত্রুটি না হয়। এমনি শুদ্ধাচারে ঠাকুর ভোগের সমস্ত কিছুই শিখিয়ে দিয়েছিলেন সঙ্ঘজননী ভৈরবীমা।

সনাতন যুগের মুনি-ঋষিদের তপোবনের ভাবধারা নিয়েই শ্রীশ্রীঠাকুর যেখানে যেমনটি সাজে তেমনি ভাবে সুবিন্যস্ত করে আসামের এক নিভৃত প্রান্তে গড়ে তুলেছিলেন এই মঠটিকে। ৬০।৬৫ বিঘা আয়তন বিশিষ্ট জমির চতুঃস্পার্শে দুর্ভেদ্য বাঁশের বন। কলা স্থলপদ্ম ইত্যাদি নানাজাতীয়

বৃক্ষ মঠের চতুস্পার্শকে এমন ভাবে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল যে তা ভেদ করে কোন প্রাণীর প্রবেশ সম্ভব হত না। বহিরাগতদের এর মধ্যে প্রবেশের অধিকার থাকত না। অন্তঃপুরবাসিনী মাকে বাইরের লোক তো দূরের কথা—অন্তেবাসীরাও সব সময় তাঁর দেখা পেত না। এমন কি মঠে দু'চার মাস থেকে যারা গৃহে ফিরে যেতেন-তাদেরও অনেকেই মঠে ভৈরবীমা বলে কেউ আছেন তা জানতেও পারতেন না।

মঠের দৈনন্দিন জীবনে অন্তেবাসীদের কঠোর কৃচ্ছতার মধ্যেও কোন দৈন্যতাবোধ ছিলনা। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসীম করুণা আর করুণাময়ী মায়ের অসীম মমতার আকর্ষণ অন্তেবাসীদের প্রাণে নিত্যনূতন ভাবে কর্ম্মের আনন্দ ও প্রেরণা জাগিয়ে তুলত। ঠাকুরগত প্রাণ প্রত্যেক অন্তেবাসী সেবক সন্তানদের প্রতি ছিল মায়ের সমবেদনা। যেমন তাদের আচার ব্যবহার ও কর্ম্মের প্রতি থাকত মায়ের সজাগ দৃষ্টি তেমনি গভীর স্নেহদৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত তাদের মন ও স্বাস্থ্যের প্রতি। মঠে একবার কঠিন রোগাক্রান্ত হই। প্রায় চারি মাস পর আরোগ্যলাভ করলেও কিন্তু শরীর রক্তাল্পতায় খুবই দুর্ব্বল। মা ব্যবস্থা করলেন একপোযা মুড়ির সঙ্গে সাত-আটদিন কাঁচা রসুনের কোয়া খেতে। শুধু ব্যবস্থা করেই মা তাঁর কর্ত্তব্য শেষ করলেন না, নিত্যই নিজে ভেতর থেকে তা পাঠিযে দিতেন। আশ্চর্য্য ১৫।২০ দিনের মধ্যেই আমি আবার সবলতা ফিরে পেলাম।

সংসার ত্যাগী অন্তেবাসীরা মঠের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে মা নিদারুণ আঘাত পেতেন দুটি কারণে। প্রথমতঃ—মা, বাবা, ভাই, বোন এমন কি স্ত্রী পুত্র সব ত্যাগ করে ইহকাল পরকালের কল্যাণ কামনা নিয়ে যে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ প্রান্তে আশ্রয় নিয়েছে সে যদি শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশিত নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তবে তিনিই যে হবেন প্রত্যয়ভাগী। দ্বিতীয়তঃ সেই সর্ব্বত্যাগী অন্তেবাসী সন্তানদের ত্রুটী বিচ্যুতির কথা যখন ঠাকুরের কানে যাবে, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর কতনা ব্যথিত হবেন। তিনি যে সর্ব্বজননী —সবহারাদের মা। একদিকে মাতৃ হৃদয়ের বেদনা, অপরদিকে আরাধ্য দেবতার প্রাণের ব্যথা—দুদিক ভেবেই তাঁর অশ্রু ঝরত।

প্রতি সপ্তাহেই একজন নৈষ্টিক ব্রহ্মচারীর উপর দায়িত্ব থাকত মঠের কার্য্যাদির পরিচালনা ও অন্তেবাসীদের দোষ গুণ-ত্রুটী বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন করতে। মঠাধ্যক্ষ থাকবেন দ্রষ্টা এবং শ্রোতা রূপে। তিনি

আবার মঠাধিষ্ঠাতৃ ভৈরবীমায়ের সঙ্গে পরামর্শ করেই যাবতীয় কর্ম সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন। এই ছিল সার্ব্বভৌম নিয়ম। একদিন মঠের বিধি নিয়ম লঙ্ঘন করে আমি আর নরসিংদা প্রাক্তন অন্তেবাসী বসন্তদাদার অনুরোধে তার বাড়ীতে সন্ধ্যারতির অবকাশ না দিয়েই হালুয়া আর পরোটা ভেঁজে খাই। কিন্তু মনে অশান্তি। আর এই ত্রুটীর প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রায়োপবেশনের মনস্থঃ করি এবং সেই মত পরদিবস যথাবিধি ভোগ হওয়া সত্ত্বেও আমি অন্তেবাসীদের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণে না গিয়ে আমার কুটীরেই অবস্থান করি। কথাটি ইতিমধ্যে মায়ের কানে পৌছে গিয়েছে। জনৈক সেবককে দিয়ে মা আমায় বলে পাঠালেন প্রসাদ নিতে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আদেশ মাথায় নিয়ে গেলাম মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। গিয়ে দেখি দরজার সম্মুখে আমারই অপেক্ষায় তিনি দাঁড়িয়ে। নতজানু হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁডাতেই, করুণা বিগলিত কণ্ঠে মা বললেন—"বাবা সংসারের সব সুখ ত্যাগ করে এসেছ ঠাকুরের করুণা লাভের আশায়। আজ পর্য্যন্ত তোমার দোষ ত্রুটীর কথা আমার কানে আসেনি। কিন্তু আজ যদি একথা ঠাকুরের কানে যায় তিনি কত আঘাত পাবেন বল দেখি। নরসিংহ ছোট থেকেই মঠে মানুষ—ওর কথা স্বতন্ত্র। এবার প্রসাদ নিতে যাও। এই রকম ত্রুটী যেন আর না হয়। তোমরা উপবাসী থাকলে আমার মুখে কি করে অন্ন উঠবে বল?" কথাগুলি বলতে বলতে মায়ের দু'চোখ জলে ভরে উঠল। মাতৃ-স্নেহের বিগলিত ধারায় আমি অভিস্নাত।

অসামান্য ত্যাগ, গুরুভক্তি ও সেবার প্রভাবে অল্পকালের মধ্যেই ভৈরবীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যভাবের অধিকারিণী ও সহায় হয়ে ঠাকুরের দিব্য সঙ্কল্পকে রূপায়িত করে তুলেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাম্য ছিল বৈদিক যুগের ঋষিদের মত আদর্শ গৃহস্থ গঠন। সেই আদর্শেই তিনি আসাম মঠকেও গড়ে তুলেছিলেন। সন্ন্যাসী হয়েও যুগপৎ গৃহী ও ত্যাগীর আদর্শ শিখিয়েছেন আমাদের। জগৎজননীর ইচ্ছাই শ্রীশ্রীঠাকুরের মাঝে মূর্ত্তরূপ নিয়েছিল। আবার সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে জগজ্জননী ভৈরবী মায়ের মধ্যে আবেশিত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাকেই পূর্ণ ও জীবন্ত করে তুলেছিল। এই-ই হ'ল স্বরূপ ভাব।

এই ভাবের কথা, মাতৃস্বরূপ পরিচয় কথা নারায়ণী দেবী 'প্রাতঃ-

স্মরণীয়াতে' বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন। সেই আলোচনার সূচনামুখে যাকে স্মরণ ও মননের মধ্যে এই মাতৃবন্দনার সুযোগ লাভে নিজেকে ধন্য মনে করছি। মায়ের মধ্য দিয়ে গুরু এবং গুরুর মধ্য দিয়ে গুরু ভক্ত সমাজকে আমি আমার প্রাণাম জানাই।

গুরোর্মধ্যে স্থিতা মাতা মাতৃমধ্যে স্থিতো গুরুঃ।
গুরুর্মাতা নমস্তোহস্তু মাতৃ গুরু নমাম্যহম্ ॥

জয়গুরু

দুর্গাপুর
৪ঠা বৈশাখ

নিগমানন্দ কিঙ্কর
গুরুদাস সেন

স্মরণীয়া অবিস্মরণীয়া

গুরুপ্রাণা, সঙ্ঘ-জননী মা যোগমায়া। মঠের মা। ভৈরবী মা। পরমহংস নিগমানন্দদেবের প্রথম সন্ন্যাস দীক্ষিত সন্তান। দীক্ষান্তে নিগমানন্দদেব কর্তৃক 'যোগমায়া' এই স্বরূপ প্রাপ্ত হন। হেমলতা যোগমায়া স্বরূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন।

বেণুয়ারচরের প্রবীণ নায়েব উমাচরণ সরকার। সরকার মশায়ের স্ত্রী হেমলতা। বয়সে প্রবীণা হলেও বহিরাগত জনের কাছে অসূর্যম্পশ্যা। নবাগত তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় নেই। পরিচয়ের প্রথম সুযোগে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করতে গিয়ে তিনি প্রথমে দেখলেন তাঁর রক্তকমল সদৃশ পা দু'খানিকে। মনে মনে তখনই নিজেকে সমর্পণ করলেন সেই রাতুল চরণে। নিলেন পদাশ্রয়। হলেন পদাশ্রিতা।

তারপর……। তারপর স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলে সংসার ত্যাগ। আশ্রমিক জীবন বরণ। মধ্যপথে স্বামী, সরকায় মশাই আবার অনাশ্রমিক হলেন। ফিরে গেলেন। গুরৈকপ্রাণা হেমলতা দাম্পত্য জীবনে আর ফিরলেন না। বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ ও গুরুনিষ্ঠার শান্ত রসে অভিষিক্ত মন আশ্রমবাসিনী এই হেমলতাই যোগমায়া। পরবর্তীকালে ভৈরবীমা, 'মঠের মা'।

'যোগমায়া' ব্রহ্মের আবরিকা শক্তি। এই শক্তির আকর্ষণেই নিগু'ণ ব্রহ্ম সগুণ ঈশ্বরে প্রকাশিত-হন। মহামায়ার এই অন্তরঙ্গা শক্তিতেই সগুণ ঈশ্বরের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা লীলা প্রকটিত হয়। তাই যোগমায়া বা মহামায়া ব্রহ্ম-বা জগদ্‌গুরুর'লীলা সূত্রধারণকরী।

সদ্‌গুরু নিগমানন্দের প্রথম সন্ন্যাস দীক্ষিতা হেমলতাও নিগম বোধি বৃক্ষ আশ্রয় করে দীক্ষান্তে হলেন যোগমায়া—নিগম লীলা সূত্রধারণকরী। শিষ্যারূপে গুরুকে শুধু প্রাণের ভক্তি নিবেদনই নয়, প্রাণের ঐকান্তিকতা নিয়ে সেবা ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে তাঁকে সমনস্কভাবে ঘিরে থাকতেন এই মা যোগমায়া। অযত্নলালিত বিশুষ্কদেহ তরুণ পরমহংস যখন গুরু নিগমানন্দ রূপে সাধারণের কাছে গৃহীত হলেন, পরবর্তীকালের সেই বর-বপুর অনেকখানিই মা যোগমায়ার যত্ন কৃত। তাই সেই বিরাট দেহী গুরু বর নিগমানন্দ বিগ্রহের বর্ণনা প্রসঙ্গে অনির্বাণ বলেছেন 'যোগমায়ার ঠাকুর'।

এই ঠাকুর সেবা যে কী—আমাদের কাছে তার চরম আদর্শ মা যোগমায়া। আমরা পুরাণ-কথায় ঠাকুর সেবার অনেক কাহিনী পড়েছি। পড়েছি মীরার ঠাকুর সেবার কথা। কিন্তু পুরাণ-কথার বাস্তবরূপ দেখেছি

মা যোগমায়ার সেবা ব্রতে। হ্যাঁ, সেবাই যে ব্রত, সেবাই যে পূজা তা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল তাঁর ঠাকুর সেবায়। আর এই ঠাকুর সেবার মধ্য দিয়েই মা যোগমায়ার মধ্যে বৈষ্ণবীয় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের বিভিন্ন ভাব বিভিন্ন সময়ে প্রতিফলিত হত।

'রাধা ভাব দ্যুতি সুবলিত' গৌরাঙ্গের মধ্য দিয়ে যেমন অপ্রাকৃত 'রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা' প্রাকৃতজনের বোধগম্য হয়েছিল, তেমনি ইষ্টসেবা, গুরু সেবা যে কেমন হওয়া উচিত, ঐকান্তিকতা নিষ্ঠা হৃদয়াতির মিলনে তার প্রকাশ যে কত উর্ধ্বগ হতে পারে তার বাস্তব দৃষ্টান্ত গুরুপ্রাণা মা যোগমায়া। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সেবাই ছিল তাঁর সন্ন্যাস ব্রত, তাঁর ভজন-পূজন।

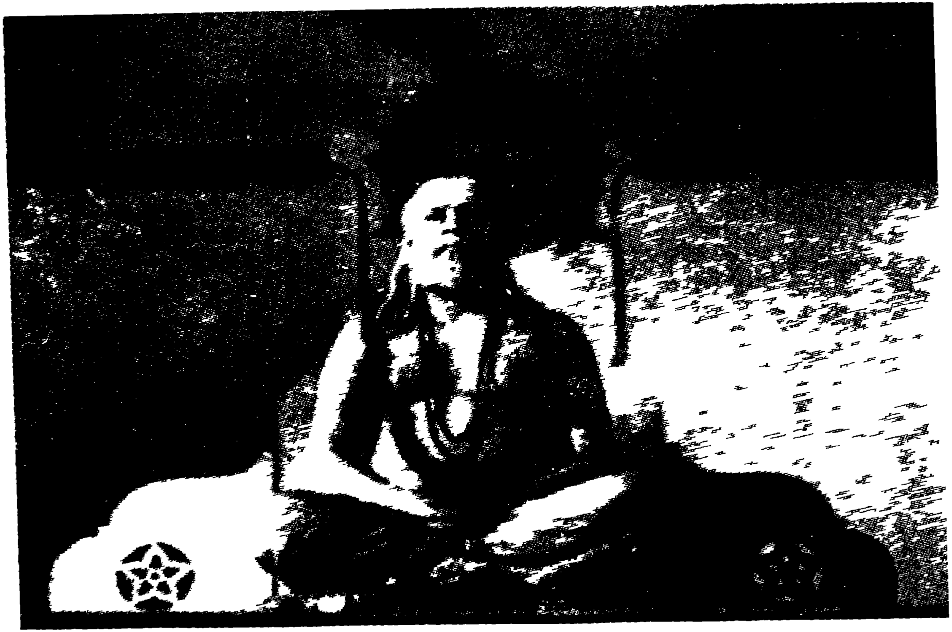
এই সন্ন্যাসব্রতের সাধনাতেই তিনি পরিব্রাজক পরমহংস সন্ন্যাসীর আবরিকা শক্তি যোগমায়া হয়ে উঠলেন। মা যোগমায়া এবং অন্যান্য ভক্ত শিষ্যের অন্তরের টানে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন শান্তি-আশ্রম। শিষ্য ভক্তগণের অন্তর আকুতির সঙ্গে সদ্‌গুরুর ইচ্ছা যুক্ত হয়ে দ্বৈত চিন্তা অদ্বয় চিন্তায় রূপ নিল। সেই অদ্বৈত চিন্তার ফলই হল শান্তি আশ্রম তথা আসাম মঠ। গড়ে উঠল মঠাশ্রিত আশ্রম সমূহ। পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে সমাগত অগণিত ভক্ত শিষ্যগণের কাছে মা যোগমায়া হলেন সঙ্ঘ-জননী। শ্রীশ্রীঠাকুর সেবায় নবাগতদের কাছে তিনি ছিলেন আদর্শ, ছিলেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সেবায় তুষ্ট করে সেবার সাধনাতেই যে ঈশ্বর বা গুরুকে লাভ করা যায়, অথবা তিনি ধরা দেন তার প্রমাণ মা যোগমায়া।

নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি মার্গের সাধনায়—অহংবোধের অবলুপ্তি বা নিবৃত্তি অথবা বিশ্বাত্মবোধের মধ্যে অহংবোধের প্রসার বা বিস্তৃতি যদি সন্ন্যাস ধর্মের লক্ষ্য হয় তাহলে নিজবোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গুরু ভাবনা এবং গুরু-জন ভাবনায় মা যোগমায়ার সেই সন্ন্যাস সিদ্ধি ঘটেছিল। নিজের আত্মবোধকে গুরৈকচেতনার বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করে সর্বজন কল্যাণ চেতনায় নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সাধনার উভয় মার্গেই তিনি হয়েছিলেন আপ্তকাম—সিদ্ধা সন্ন্যাসিনী। আর এইরূপেই তিনি আমাদের কাছে মঠের মা, গুরু প্রাণা সঙ্ঘ-জননী মা যোগমায়া।

মায়ের এই পূতজীবন কথা পরবর্তীকালের নিগম আশ্রিত শিষ্য ভক্তের কাছে প্রায় বিস্মৃত অধ্যায়। নিগম সৌরমণ্ডলের অনেকেই আজ বিস্মৃতির বল্মীকস্তূপে গুপ্ত প্রায়। সেই প্রায় লুপ্ত-কথা পুনরুদ্ধার কল্পে সেই নিগম

পরিকরদের মধ্য থেকে কয়েকজন অবিস্মরণীয়া এবং স্মরণীয়া সন্ন্যাসিনীর জীবন কথাকে 'প্রাতঃস্মরণীয়া' রূপ স্মৃতির মালিকায় গ্রন্থনের প্রয়াস নারায়ণীদেবী আরম্ভ করেছিলেন। শেষ করতে পেরেছিলেন কিনা জানি না। মালিকার শ্রেষ্ঠ কুসুম মা যোগমায়ার জীবন কথাই আমাদের হাতে এসেছে। তবু যে অন্ততঃ একজনেরও পরিচয় তাঁর লেখনী মারফত আমরা পেয়েছি, এ জন্য শ্রদ্ধেয়া নারায়ণীদেবীকে অন্তরের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই। আর সেই জীবনকথাকে নিগমানন্দ আর্য-দর্পণের বিবর্ণ পাতা থেকে সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে তার একটা স্থায়ী রূপ দেবার সাধু ইচ্ছায় উদ্যোগী হয়েছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের 'বালক-বন্ধু' ঠাকুর-প্রাণ শ্রীবলাই চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবনায় দীপ্ত-প্রাণা শ্রীমতী দীপালি দেবী প্রকাশিকারূপে সেই উদ্যোগকে বাস্তব রূপ দিলেন। অগণিত নিগম সন্তানগণের পক্ষ থেকে তাঁদের জানাই অন্তরের সাধুবাদ। শ্রীশ্রীঠাকুর চরণে জানাই তাঁদের সর্বাঙ্গীণ শুভ কামনা। মণি-মাণিক্য আহরণে তাঁদের অনলস প্রচেষ্টা তাঁদের দীর্ঘ জীবনলাভে দীর্ঘায়িত হোক, শ্রীশ্রীঠাকুর সমীপে এই-ই প্রার্থনা।

বীরেন্দ্র কুমার চৌধুরী



শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের মর্ম্মরমূর্ত্তি
(হালিসহর শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সমাধিপীঠ।

প্রাতঃস্মরণীয়া মা যোগমায়া

ঠাকুর নিগমানন্দের মতে মেয়েরা সেবিকা ও প্রেমিকা রূপেই পূজনীয়া।

'তাই স্বয়ং জগজ্জননী নিজে গুরু না হইয়া জগদ্গুরুর দাসীত্ব স্বীকার করিয়া বরণীয়া ও মহনীয়া হইয়াছেন।"

শ্রীনিগমানন্দদেব তাঁর শিষ্যাদের এই আত্মোৎসর্গের সাধনাতে দীক্ষিতা করেছিলেন। তাই যে সব প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলা সারস্বত সংঘের গুরুপীঠে কায়মনোবাক্যে নিজেদের অর্ঘ্য দিয়েছিলেন—তাঁদের দুই তিনজন শ্রীনিগমানন্দদেব স্থূলে বর্ত্তমান থাকা কালেই পূজার ফুলের মত তার পাদপদ্মে লীন হলেও কোনও দিন আর্য্যদর্পণের পাতায় তাঁদের কারও স্মৃতি তর্পণ করা তিনি প্রয়োজন মনে করেননি। অথচ তাঁর বিশিষ্ট ভক্তশিষ্যদের প্রত্যেকের স্মৃতিতর্পণের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করতেন। ঠাকুর নিগমানন্দের এই কঠোর আদর্শাবলম্বনের ফলেই সারস্বত সংঘের সেবিকারা বহ্নিস্ফুলিঙ্গের মত কয়েক পল মাত্র জ্যোতি বিকিরণ করে ঠাকুরাণী সুধাংশুবালার মহাজ্যোতি পারাবারে হারিয়ে গেছেন। তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া রীতিমত কঠিন।

কিন্তু মেয়ের তো মায়ের স্মৃতি পূজায় কোন বাধা নেই। শ্রীনিগমানন্দ পরমহংসদেব এবার শত বৎসরের পুরাতন এক বিরাট পুরুষ হতে চলেছেন। এরই মধ্যে তাঁর জীবনেরই কত কাহিনী কত দিব্যমধুরলীলা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং যাঁদের চিরদিন নেপথ্যবর্ত্তিনী রেখে বিস্মরণে নিমজ্জিত হওয়ার শিক্ষা ও অনুশাসনে শাসিত করেছিলেন, তাঁদের কি ভবিষ্যতে আর আমরা খুঁজে পাব? অথচ পাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন—সংঘের আগামী কালের মা বোনদের জন্যই ঠাকুর নিগমানন্দদেবের নিজে হাতে গড়া ওই মায়েদের পূত চরিতকথা আলোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

শ্রীগুরুর অপার করুণায় আজও ঠাকুর নিগমানন্দদেবের এক সন্ন্যাসিনী শিষ্যা আমাদের মধ্যে আছেন; সেই সন্ন্যাসিনী মায়ের (নীলাচল মহিলা সারস্বত সংঘের বড় মা) মুখ হতে পূর্ববর্তী অন্যান্য মায়েদের কথা যা আমি জেনেছি ও শুনেছি—ভাবী কালের 'নিগমানন্দ সুতাদের' হাতে এবার তা আমি তুলে দিতে চাই। পরমারাধ্য ঠাকুর নিগমানন্দ, সেই পুণ্যব্রত পালনে কৃপাকটাক্ষে শক্তি সঞ্চার করুণ, শ্রীচরণে এই-ই প্রার্থনা।

এ ব্রত উদ্‌যাপনে আমার সহায়ক আছেন নিগমানন্দ কৃপাধন্য শ্রীমৎ যোগানন্দ ও প্রেমানন্দ মহারাজ, যোগেশ্বর গাঙ্গুলী, শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র রায়, শ্রীযতীন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং শ্রীফণীভূষণ মিত্র। এ ছাড়া নানা জায়গায় কিছু টুকরো টুকরো তথ্যও ছড়ানো আছে। সব কিছু মিলিয়ে গেঁথে তুলব মাতৃবন্দনার মঙ্গল গাথা—সে গাথা সারস্বত সংঘের জননী দুহিতা আয়া সহোদরাদের পক্ষে 'দেবীসূক্তে'র মতই পবিত্র এবং মাহেশ্বরী চরিতের প্রকট মহিমার এক অধ্যায় বিশেষ।

সদগুরু নিগমানন্দদেবের কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা লাভের অধিকারিণী তাঁর পাঁচটি সন্ন্যাসিনী শিষ্যা যোগমায়া দেবী, শান্তিময়ী দেবী, ব্রহ্মচারিণী শৈলবালা, সরযুবা ও সুরমা। এঁদের মধ্যে প্রথমে বলছি যোগমায়া দেবীর কথা।

কথারম্ভের সূচনায় করজোড়ে একবার গুরুশক্তিরূপা মা-ঠাকুরাণীর প্রসন্নতা যাচ্ঞা করি—

"কেবল করুণা ভিখারী তাই ডাকি মা 'তারা' তোরে।
আর কোন বাসনা নাই মা দেখা দে করুণা করে॥"

তান্ত্রিক গুরুর প্রথম সংস্করণে মুখবন্ধ হিসাবে গ্রন্থকার পরমহংস নিগমানন্দ দেব এই প্রার্থনাটি নিবেদন করেছেন কেন? কারণ এইটি তাঁর গুরুদায়ের অন্যতম অঙ্গ। শিষ্যদের স্বীয় জ্ঞান বিতরণে ভব-বন্ধন হতে মুক্ত করে ব্রহ্মত্ব বা স্ব-স্বরূপদান ও শিষ্যদের প্রেম-ভক্তিতে ঐশ্বর্য্য শালিনী করে ভগবৎ

সেবায় ব্রতী করাই সদ্‌গুরু নিগমানন্দের জগদ্ধিতকর কার্য্য। যোগীগুরুতে তিনি শিষ্যদের জন্য জগদ্‌গুরুর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, তান্ত্রিকগুরুতে পরমেশ্বরীকে বলেছেন শিষ্যদের গতি মুক্তির কথা। উপরোক্ত দুই ছত্রের সারমর্ম এই রকম—

সূক্ষ্মে ভাবলোকে ঠাকুর নিগমানন্দ 'নিগমার্থ গোচরকরী' যে ব্রহ্মশক্তিকে 'গৌরী উমা শঙ্করী' (কন্যা জায়া ও জননী) রূপে 'গারোহিল যোগাশ্রমে' প্রত্যক্ষ করেছিলেন, স্থূল জগতে তিনিই 'কৌমারী' অর্থাৎ বালিকা রূপে সাধারণ প্রাকৃত নারীদেহে বিরাজমান। প্রত্যেক মেয়েই সেই মহামাহেশ্বরীর ছায়া। তারা আত্মবিস্মৃতা, জানে না তারা কে, তারা কি! কেবল একটি পুরুষের সংসার সঙ্গিনী হয়ে কতকগুলি জীবকে লালন পালন করলেই কি তাদের জন্ম ও জীবনধারণ সার্থক হবে? না, প্রতিটি মেয়ের পরম লক্ষ হবে যে শ্রীগুরুর বামাঙ্গ পীঠস্থিতা দিব্যশক্তি জগন্মাতার মহাভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে গুরুদেবের বিশ্বহিত কাজেও আত্মনিবেদন। পিতা-মাতা ভাই-ভগ্নী স্বামী-পুত্রের সেবা এই লক্ষ্যের এক দেশ মাত্র, সবটুকু নয়। সদ্‌গুরু তাই তাঁর কন্যাদের কল্যাণার্থে মাহেশ্বরীকে বলেছেন 'দেবি আমার! প্রকাশিত হও—একবার প্রত্যক্ষ করি। সাধনার সাধ পুরাও গো!' এই দেবী সম্বোধনের উদ্দিষ্টা এখানে মহামায়া, যিনি শুধু জীবের নয়, শিবেরও মা। স্মরণীয় দেবীসূক্ত "অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন"—যাঁকে তোমরা পিতা বল তাঁকে আমিই প্রসব করে দ্যুলোক মূর্ধায় স্থাপন করেছি। ঠাকুর নিগমানন্দ এ তত্ত্ব জেনে লিখলেন "কালী হ'তে শূলী কিন্তু পত্নী ঘোষে, লক্ষীরূপে সেই সেবে শ্রীনিবাসে. আবার উনি (ওরা) ছিল ঐ গর্ভবাসে"—"জ্ঞানীগুরু"। তান্ত্রিকগুরু তাই শিবরূপী সদ্‌গুরু শ্রীনিগমানন্দের গর্ভধারিনীর উদ্দেশে উৎসর্গিত।

ঠাকুর নিগমানন্দ শিষ্যের কাছে 'ঈশ্বরত্ব ব্রহ্মত্বের ভিখারী।' আর শিষ্যার সম্বন্ধে তাঁর একমাত্র বাসনা মাহেশ্বরী তার মাধ্যমে মর্ত্যে প্রকট হবেন—শিষ্যা কন্যার মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করবেন দেবী মহিমা। তাই বলছেন

'আর কোন বাসনা নাই মা, দেখা দে করুণা করে।' তবেই তাঁর গুরুগিরি সার্থক।

একখানি চিঠিতে ঠাকুর নিগমানন্দ খুব স্পষ্ট করে কথাটি বুঝিয়ে লিখেছেন—"আমি তোমাকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছি। আশাও ছিল তোমার মধ্যে মায়ের দর্শন পাইয়া গুরুগিরির সার্থকতা করিব। কিন্তু আমি মায়ের আসনে এ পর্য্যন্ত এক স্বার্থপর ক্ষুদ্র রমণীকে দেখিয়া আসিতেছি, এ দুঃখ কি কেহ বুঝিবে? বৎসে, নিজকে মায়ের মধ্যে ডুবাইয়া দে, তৎপরে মায়ের দেহ-ইন্দ্রিয় লইয়া ঠাকুরের কাছে আসিস।" (চিঠি ২।৪২)

এই চিঠিখানি বস্তুত সারস্বত সংঘ-ভুক্তা মেয়েদের পক্ষে 'নিগম-বেদ' বা ঠাকুর নিগমানন্দের গূঢ় মর্ম কথা। তিনি স্বয়ং যে কয়েকটি মেয়েকে ঐ বেদার্থ জীবনে ফুটিয়ে তুলবার শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছিলেন ভৈরবীমা বা যোগমায়া দেবী তাঁদের সর্বাগ্রগণ্যা।

বাংলা দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে-ময়মনসিংহ জেলার পাতিলদহ পরগণায় 'বেণুয়ার চর' নামে একটি গ্রাম ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের এক জমিদার প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সেখানে যে কাছারি বাড়ীছিল—শ্রীযুক্ত উমাচরণ সরকার ছিলেন সেই কাছারির তহসিলদার। তাঁর আদি বাস যশোর জেলায়, এ ছাড়া বিশেষ কিছু অদ্যাবধি জানা নাই। সেকালের প্রথানুসারে অল্প বয়সেই শান্তিপুরের একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্ত্রীর নাম হেমলতা। উমাচরণবাবু প্রতিপত্তিশালী সম্পন্ন গৃহী হলেও, নিঃসন্তান। সংসারে সাধ্বী স্ত্রী ছাড়া তাঁর কোনও বন্ধন ছিল না। তবে ওই একটি বন্ধনই সরকার মশায়ের পক্ষে সহস্র বন্ধন তুল্য। কারণ মা হেমলতা কেবল তাঁর গৃহিনী নন্—মনোবৃত্ত্যানুসারিণী ভার্য্যা। রন্ধন নিপুণা কর্ম কুশলা একান্ত সেবা পরায়ণা সর্বকার্যে সুনিপুণা এই সহধর্মিণী পুত্রহীন তহসিলদারের একমাত্র অবলম্বন। স্ত্রীর কোনও অনুরোধ রক্ষা না করার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। আর হেমলতা মা জানতেন তাঁর স্বামী দেবচরিত্র

পুরুষ, জীবনে কখনও তিনি তাঁর মনঃপীড়ার হেতু হন নি। সুতরাং সুশীলা হিন্দু পত্নীর আদর্শে সর্বদাই তিনি উমাচরণবাবুকে সেবা যত্নে সুখে রাখতে চাইতেন। সন্তানাদি না হওয়ায় সে যুগের হিন্দু দম্পতির আদর্শে স্বামী স্ত্রী সাধুসেবা, ব্রত ও নিয়ম ইত্যাদি ধর্মকর্ম জীবনের পরম অবলম্বন মনে করতেন। দুজনেই প্রৌঢ় বয়স্ক, সরকার মশাই অল্পদিনেই বার্দ্ধক্যের দ্বারে উপনীত হবেন। সব মিলিয়ে নিরুপদ্রব সুখের সংসার দুজনের। এমন সময় জীবনে ঘটে গেল অঘটন।

জনরবে উমাচরণ বাবুর কানে এল কংস নদীর তীরে শ্মশানের চণ্ডীমণ্ডপে হঠাৎ এক রাত্রে একজন সিদ্ধ পুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন। পূর্বদিন সন্ধ্যাতেও মণ্ডপ শূন্য ছিল। ভোর বেলায় দেখা গেল শূন্য মণ্ডপের বেদীতে পদ্মাসনে এক গৈরিক বসন সন্ন্যাসী ধ্যান মগ্ন। তাঁর দেহজ্যোতি অগ্নিবর্ণ, মাথার চুলে জটা। পাশে পড়ে আছে চিম্‌টা ও কমণ্ডলু এবং ছেঁড়া ন্যাকড়ায় বাঁধা একখানি দপ্তর ও সামান্য দু' একটি জিনিষ। বেদীতে বাঘছাল পেতে যেন সূর্য্যপ্রভ যোগীরাজ বেশে সাক্ষাৎ মহাদেব। অদূরে ছাড়া রয়েছে পায়ের খড়ম। আহা, মুক্ত পদ্মাসনে সাধুজীর দুই ঊরুপরে যেন দু'খানি স্থলপদ্ম ফুটে আছে। চোখে দেখেছে যারা তারা ভক্তি গদগদ স্বরে বলে, "না দেখলে বুঝবেন না তসিলদার মশাই—মানুষের পায়ের পাতা কি কখনও অমন লাল টুকটুকে হয়, না সর্বাঙ্গ দিয়ে আগুনের আভা ফুটে বার হচ্ছে মনে হয়?"

কেবল কি এই? অদূরে ছোট্ট গ্রাম 'ঝগড়ার চর'। সেখানকার অর্থশালী গৃহস্থ নিত্যানন্দ মোদকের স্ত্রী শূলরোগী। রোগ আজ কার নয়—আশে পাশের পাঁচখানা গ্রামের সবাই জানে পয়সা থাকলে কি হবে, মোদকের মনে সুখ নাই। বিবাহের কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রীকে ওই রোগে ধরল—দিনরাত যাতনায় কাতরায় বৌটি। কত চিকিৎসা হল, কত গুণী এল, কত সাধুকে ধরা গেল, তাতে কেবল মোদকের জলের মত পয়সা খরচই সার। রোগ একতিল কমেনি। এই সাধুর কথা কানে যেতেই নিত্যানন্দ ছুটে এসেছিলেন দেখতে। তারপর, অবাক কাণ্ড। সাধু রাজী হলেন

ওঁর স্ত্রীকে ঝাড়াতে। হাজার লোকের সামনে দিন-দুপুরে উনুনের উপর টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে পাঁচপোয়া সরসের তেল—সেই ফুটন্ত তেলে সোনার কমলের মত বামচরণখানি ডুবিয়ে দিলেন সাধুবাবা। জনতা ভয়ে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় কাঠ হযে চেয়ে থাকে; একি স্বপ্ন না সত্য দেখছে তারা? মোদকের স্ত্রীকে আগেই সাধুর সামনে মাটিতে শোয়ান হয়েছিল। যন্ত্রণায় উঃ আঃ করছে সে, তল পেটের কাছে কাপড় সরানো খানিকটা, সাধুবাবার কথামত চিৎ হযে শুয়েছে কাপড় চোপড় সামলিয়ে। গম্ভীর স্বরে মন্ত্র পাঠ করতে করতে সাধুজী ফুটন্ত তেলের সরা হতে বাঁ পাখানি তুলেই রোগিণীর পেটে ঘসতে লাগলেন পায়ের গোড়ালি। পা হতে উত্তপ্ত তেলের ধারা ঝরছে, মোদক পত্নীর পেটে ফোস্কা পড়ে গেল দেখতে না দেখতে। সাধুজীর নরম তুলতুলে রাঙা পাখানিতে একটুও দাগ ধরেনি কিন্তু। যেমন পা তেমন আছে।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে সরকার মশাই জানতে চান 'তারপর'? 'তারপর আর কি?' প্রত্যক্ষদর্শীরা সংবাদ দেয় সাধুবাবা গিয়ে আবার চণ্ডীমণ্ডপে বসলেন। একটু পরেই মোদকের স্ত্রী ঘোম্‌টা টেনে উঠে বসল। সবাই জানতে চায় কি হল গো? ব্যথা আছে? ঘাড় নেড়ে সে বললে, 'না আর তো ব্যথা টের পাচ্ছি না।' সাধুবাবা বললেন ও ভাল হয়ে গেছে। আর কোন দিন ব্যথা ধরবে না। মোদকরা স্বামী স্ত্রী গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল তাঁর পায়ে—"বাবা আমাদের ঘরে দয়া করে পায়ের ধুলা দাও। আমরা তোমায় ছাড়ব না, যেতেই হবে।" সাধুবাবা বললেন, 'ভাবছ আমি ভেল্‌কি দেখালাম। গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেই আবার ব্যথা আরম্ভ হবে। তা কিন্তু নয়, শ্রীভগবানের কৃপায় তোমাদের ভোগকাল শেষ হয়ে গেছে আর শূল-ব্যাধির আক্রমণ হবে না।' নিত্যানন্দ বললেন, 'ভগবান তো তুমিই বাবা। যে রোগ কেউ ভাল করতে পারেনি তুমি বলছ তা ভাল হয়ে গেছে। তোমায় অবিশ্বাস করব কেন? কিন্তু বাড়ীতে যদি না যাও কি করে বুঝব সত্যিই চিরদিনের মত কৃপা করলে?' বড়ই চতুর মোদক মশাই কেমন কায়দা করে

সাধুবাবাকে আটকাতে চায়। তিনি বোধ হয় তা বুঝে একটু হেসে বললেন, 'আমার কোথাও যেতে আপত্তি নাই। যেখানে হ'ক একমুঠি অন্ন পেলেই হয়। তবে বেশীদিন থাকতে পারব না, আমার কাজ আছে।' নিত্যানন্দ হাতে স্বর্গ পেলেন। তখনই সাধুবাবাকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। মেলা বসে গেছে 'ঝগড়ার চরে'। গ্রামশুদ্ধ লোক সাধুবাবাকে দেখবার জন্য, একটু সেবা করার জন্য পাগল। সবাই তাঁর ভক্ত হয়েছে। খুব কীর্তন চলছে অহোরাত্র। আশে পাশের গ্রাম থেকে হরি সভায় নিয়ে যাচ্ছে বাবাকে।

এইখানে একটা কথা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'ঝগড়ার চরে'র ভক্তদের নামও আমি জানতাম না। প্রথম তাদের কথা পড়লাম শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দকৃত 'সারস্বত মঠ ও স্বামী স্বরূপানন্দ গ্রন্থে।' ১৩৩০ সালে বগুড়া ভক্ত সম্মিলনী—ঠাকুর মহারাজ উপস্থিত। ছেলেদের প্রণাম শেষ হইতেই মেয়েদের প্রণাম আরম্ভ হইল। ঝগড়ার চরে'র মেয়েরা প্রণাম করিতে আসিয়া বীরাসনে বসিয়া সকলেই জোড়হাত করত 'গুরুদেব দয়া কর দীন জনে' এই স্তব উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁদের কি ব্যাকুলতা। কি ঐকান্তিকতা। কি উচ্ছ্বাস। নয়নের দরবিগলিত ধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। 'গুরুদেব দয়া কর দীন জনে' ধ্বনি যেন তাঁহাদের অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বলিলেন,-"আমি তোমাদের দয়া করব"—তখন ঠাকুরের আশ্বাসবাণী পাইয়া শান্ত হইলেন।

লেখক প্রেমানন্দজী বলেছেন এঁরা ঠাকুরের প্রথম যুগের ভক্ত। যখন ঠাকুর সারাদেশে ঠাকুর বলে প্রতিষ্ঠা পাননি, এঁরা তখন হতে তাঁর ভক্ত। ছাব্বিশ বছর বয়সের ঠাকুর, দেখতে তখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ—দাড়ি গোঁফের রেখা পড়েছে কি পড়ে নাই। গ্রামের মেয়েদের 'মা' বলে ডেকে আবদার করে মুড়ি চেয়ে খেতেন—সেকথা সেই সরলা গ্রামবালারা ভোলেনি।

এইসব কথা জানবার অল্পদিন পরেই ঠাকুরের ইচ্ছায় স্বয়ং নিত্যানন্দ মোদক নীলাচল কুটিরে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শেষ বাসস্থলী দর্শন করবার জন্য। তিনি ময়মনসিংহ জেলার 'ঝগড়ার চর' হতে এসেছেন ও তাঁর নাম শুনেই আমি বৃদ্ধা ডাক্তার মাকে মধ্যস্থ রেখে আলাপ করলাম বৃদ্ধের সঙ্গে। তাঁর বয়স নিশ্চয় আশীর কাছাকাছি তখন—কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল আছে বলে স্থবির মনে হয় না। ঠাকুরের কথা তুলতেই নিত্যানন্দ দাদা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, "আরে! আমার স্ত্রীর রোগ সারিয়ে দিয়েই তো ঠাকুর ধরা পড়ে গেল। ধরে নিয়ে গেলাম বাড়ীতে—এখানে ওখানে সবাই নিয়ে যেত। কিন্তু স্থায়ী বাস ছিল আমার কাছেই। তখন কি যোগৈশ্বর্য্য ছিল তাঁর। কত যে বিভূতি চোখে দেখেছি মা! একদিন বলছেন 'গাঁজা খাব নিয়ে আয়!' ওসব দেশে তো দোকান বাজার নাই যে চাইলেই এসব মিলবে। কোন গ্রামে কে গাঁজা খায় লোক পাঠিয়ে তার কাছ হতে আনাব ভাবছি, এমন সময় ঠাকুর নিজের খালি ঝোলাটা ২/৩ বার ঝাড়া দিতেই এতখানি গাঁজা বেরিয়ে এলো। আগের দিন সন্ধ্যাতেই আমাদের সামনে ঝোলা ঝেড়ে গাঁজার পুঁটুলি বার করে সেজে খেয়েছে। ঝোলাটায় গাঁজার কলকে ছাড়া এক বিন্দু গাঁজা ছিল না—নিজের চোখে দেখা। শুধু কি তাই? ঠাকুর তখন নিজে রেঁধে খেতো—সিধা দিতাম, ওই ঘরেই চুল্লী এনে দিয়েছিলাম একটা। গাঁজা সেজে চুলার ছাইগুলো নেড়ে চেড়ে ফুঁ দিতেই দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। সেই আগুনে টিকা ধরিয়ে গাঁজা খেতে লাগল। কখনও বা কি মনে হল—আমায় বলল, 'টাকা নিবি, টাকা,? একমুঠো ছাই তুলে হাতে ঝাঁকানি দিয়ে মুঠি খুলল—দেখি একমুঠি রূপার টাকা। জিজ্ঞাসা করি 'তবে যে বল তুমি বই ছাপাবে—তার জন্য টাকা যোগাড় করতে লোকালয়ে এসেছ? তোমার টাকার অভাব কি?' হেসে বলল, 'এ টাকা তোদের দিতে পারি—নিজে নিতে পারিনা। গুরুর আদেশ নিজের জন্য আমায় ভিক্ষা করেই টাকা যোগাড় করতে হবে।' অত বড় সিদ্ধপুরুষ আমাদের চোদ্দপুরুষে কেউ দেখেনি—অথচ বাইরে ঠিক

যেন একটি ছোট ছেলে, নয় তো পাগল ! কে বুঝবে তাকে ? মাথায় হাত ঠেকিয়ে উদ্দেশে ঠাকুরকে প্রণাম করে একটু রাগের সুরে মোদকমশাই বলে উঠলেন, 'আরে ! তসিলদার মশায় ঠাকুরকে পেত কোথায় ? আমার ঘরে নিত্য যাওয়া আসা শুরু করল। শেষে আমার ওই টানতেই তো ঠাকুরকে বাগাইয়া লইয়া গ্যাল গ৷ !''

শেষ ছত্রটি নিত্যানন্দ মোদকের মাতৃভাষাতেই তুলে দিলাম। শুনেই বুঝলাম তাঁর বাড়ি হতে নিয়ে গিয়ে সরকার মশাই যে সেবা-যত্নে ঠাকুরকে 'বেণুয়ার চরে'ই আবদ্ধ করে ফেললেন—সেই গায়ের জ্বালাটা নিত্যানন্দ দাদার আজও যায়নি। যেন তাঁর নিজস্ব জিনিষটি গায়ের জোরে বড়লোক তসিলদার দখল করে নিলেন !

'ঝগড়ার চর' ছাড়া ওই অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামেও শ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী-দেবের নানা যোগৈশ্বর্যের কথা মুখে মুখে ফিরতে থাকে। নিত্যানন্দ মোদকের বাড়িতে গিয়ে নিজের চোখে তাঁকে দেখে বহুদর্শী উমাচরণ সরকার বুঝলেন এ খাঁটি সোনা, এক কণা খাদ নাই। অনেক জন্মের পূণ্যে এমন সাধুর সেবা করবার সৌভাগ্য ঘটে। হাতে পায়ে ধরে এক রকম জোর করেই সরকার মশাই শ্রীনিগমানন্দকে নিজের ঘরে ধরে আনলেন। আলাদা থাকার ঘর, সেবা করার লোকজন -কিছুরই অভাব রাখেন না তসিলদার। এমন কি সাধুবাবা নিজের হাতে রেঁধে খাবেন এও তিনি হতে দিলেন না। ব্রাহ্মণ পাচক ঠিক করলেন একটি। তাঁকে তাঁর রন্ধননিপুণা কর্ম্মকুশলা গৃহিণী স্বয়ং শিখিয়ে-পড়িয়ে অতিথি নারায়ণের ভোগ প্রস্তুত করে দেন। প্রথম দিকে সে যুগের স্বাভাবিক কুণ্ঠা বশতঃ হেমলতা মা ঠাকুরের সামনে আসতেন না -আড়াল হতে পরিচারকদের দিয়েই সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু দৈব-গত্যা একদিন স্বচক্ষে সাধুজীর দিব্য বিগ্রহ দেখে অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় সরকার পত্নীর সব কুণ্ঠা দূরে গেল। নিজে সামনে বসে সাধুকে খাওয়াবেন ঠিক করলেন। তারপর সেই সূত্রে সামনে এসে শ্রীপাদপদ্ম ছুটি দেখে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। পা ছুখানির সামনে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে আরম্ভ

করলেন প্রৌঢ়া হেমলতা মা। ওই পাদপদ্ম দুখানি যেন কত যুগ ধরে খুঁজে ফিরছিলেন। এতদিনে মিলেছে সে-হারানিধি। অতঃপর এক প্রাণ এক মন হয়ে সরকার দম্পতি নিতান্ত অল্প বয়সী অথচ যোগসিদ্ধ মহাপুরুষকে ভক্তি-মিশ্রিত বাৎসল্যে সর্ব্বান্তঃকরণে অহোরাত্র সেবা-যত্ন করেন।

কৃচ্ছ্রসাধনে অস্থিচর্ম্মসার আহার নিদ্রায় নিতান্ত অমনোযোগী সর্বদাই ভাব-বিভোর ঠাকুর মহারাজকে প্রায় বৎসরকাল প্রাণপণে যত্ন করা সত্ত্বেও তাঁর শ্রীমূর্ত্তি যে কত বিশুষ্ক ছিল যোগীগুরুর প্রথম সংস্করণের আলোকচিত্র তার প্রমাণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখনও পরিব্রাজক, নানা প্রয়োজনে সর্বদাই ভ্রমণরত। একস্থানে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। সুতরাং 'বেণুযার চরে' যে সময় থাকেন তখনই যা সেবা-শুশ্রূষার অবসর মেলে। ভ্রমণকালে আর সেবা করবেন কি করে? সেজন্য তসিলদার-দম্পতির কেবলই প্রাণ কাঁদে। বিশেষতঃ সন্তানহীনা হেমলতা মায়ের এই বালক স্বভাব পরমহংস একাধারে গুরু, ইষ্ট, পরমাত্মীয় এবং একান্ত স্নেহের নিধি যেন। তিনি ঠাকুর মহারাজের চেয়ে বার-তের বৎসরের বড়, উমাচরণবাবু প্রায় কুড়ি বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ। সহজেই তাঁদের মনে গারো-হাজংদের এই পাগলা ঠাকুরটির প্রতি যত শ্রদ্ধা-ভক্তি ঠিক ততখানিই গভীর স্নেহ-প্রীতি জন্মেছিল। দুজনেরই মনে হত, 'ঠাকুর যখন ভ্রমণে যান তখনও যদি আমরা সঙ্গে থাকতাম তাহলে ঠিক মত যত্ন হত। বাইরে গেলেই খাওয়া-ঘুমের অনিয়মে ঠাকুরের শরীর খারাপ হয়, কষ্ট হয়। যখন ঠাকুর তাঁদের বাড়ীতে থাকেন মনে হয় সংসার ভরা রয়েছে, দিন যাত্রা সার্থক। তিনি চলে গেলেই আর যেন দিন কাটেনা, ঘরে মন বসে না।'

"যোগীগুরু" ছাপাবার ব্যবস্থা করে কলিকাতা হতে শ্রীশ্রীঠাকুর এলাহাবাদ কুম্ভে যোগ দেন ও শৃঙ্গেরী মঠের জগদ্গুরুর সমর্থনে সচ্চিদানন্দজী তাঁর দণ্ড-কমণ্ডলু ত্রিবেণী স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে শাস্ত্র সম্মত ভাবে

ঠাকুরকে "পরমহংস" পদবী দান করেন। তারপর তাঁর গুরুগিরির অধিকারও যে গুরু দত্ত, এইটি প্রতিপন্ন করার জন্য সচ্চিদানন্দজী স্বয়ং তাঁর 'বাচ্চা'র সঙ্গে গৌহাটি আসেন এবং সচ্চিদানন্দ পরমহংসদেবের কাছে দীক্ষার্থী যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাসকে আদেশ করেন, 'তুমি সস্ত্রীক ওর কাছে দীক্ষা নাও। ও এখন আমার চেয়েও অনেক বড় হয়ে গেছে।' পুত্রতুল্য তরুণ বয়স্ক শ্রীনিগমানন্দকে গুরুবরণ করায় যজ্ঞেশ্বরবাবুর মনে দ্বিধা ছিল। কিন্তু পরমহংসজী নিজে তাঁকে তাঁর চেয়ে বড় বলে মান দেওয়ায় সচ্চিদানন্দজীর উপস্থিতিতেই বিশ্বাস দম্পতি শ্রীনিগমানন্দকে গুরুবরণ করে তাঁর প্রথম শিষ্য হলেন।

গৌহাটি হতে ফিরেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর এ সংবাদ জানতেই সরকার দম্পতি অবিলম্বে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। সে যুগের I. C. S. সাহেবী ভাবাপন্ন যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাসের মনে তরুণ পরমহংসটির জ্ঞানগরিমায় কিছু সংশয় থাকলেও গ্রামের মানুষ ও প্রাচীন হিন্দুসমাজে লালিত-পালিত সস্ত্রীক উমাচরণবাবু প্রথম হতেই ঠাকুর মহারাজকে মহাপুরুষ জ্ঞান করেছেন। ঠাকুরকে ঘরে আনবার অল্পদিন পরেই দীক্ষা-প্রার্থী হয়েছিলেন তাঁরা। ঠাকুর রাজী হন নি। মাহেশ্বরী অনুরোধ করলে কি হবে? গুরুগতপ্রাণ "গুরুচরণ" তিনি। শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত দণ্ড পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন নি শ্রীনিগমানন্দ। দশনামা সম্প্রদায়ের লক্ষণানুযায়ী পরমহংসত্ব লাভ করা তো ছোট কথা—'গারোহিল যোগাশ্রমে' তিনি নিজেকে বার বার 'ব্রহ্ম' বলে জেনেছিলেন, জেনেছিলেন তিনি 'মহাশক্তিরও ভর্তা ও ভোক্তা।' তবু বাইরে তিনি দণ্ডী সন্ন্যাসীই ছিলেন। গুরু-পিতার প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ ভিন্ন দণ্ড ত্যাগও করেন নি যিনি, তিনি গুরু না বলতেই সাজবেন দীক্ষা-দাতা গুরু? সে ধাতুতে শ্রীনিগমানন্দকে গড়েননি বিধাতা। মাহেশ্বরীর অনুনয়ে সংশিক্ষা বিস্তার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের দায় তিনি গ্রহণ করেছিলেন মাত্র। বিধিবদ্ধ ভাবে গুরু দায় স্বীকার করেন নি।

সচ্চিদানন্দজী স্বয়ং যখন তাঁকে গুরুভার অর্পণ করলেন, তখন হইতেই

ঠাকুর মহারাজ প্রকৃত অর্থে সদ্‌গুরুর ভূমিকা নিলেন। সস্ত্রীক উমাচরণ বাবুর ভক্তি-বিশ্বাসে আগেই তিনি মনে মনে বাঁধা পড়েছিলেন তাঁদের কাছে। তাই গৌহাটি হতে ফিরেই তাঁদের দীক্ষা দিতে আর আপত্তি করলেন না। এরপর গারোহিল যোগাশ্রমে ঠাকুর কমই যেতেন। তসিলদার গৃহই তাঁর আবাসস্থলী হয়ে উঠল। স্থানীয় লোকসমাজে প্রচার হয়েছিল আগেই। 'যোগীগুরু' প্রকাশ পাওয়া মাত্র চারিদিকে যেন সাড়া পড়ে গেল। কাজেই নানা প্রয়োজনে গারোহিলের চেয়ে 'বেণুয়ার চরে' থাকা তিনি সুবিধাজনক মনে করলেন। চিঠিপত্র লেখা, দর্শনার্থীদের সঙ্গে আলাপ ও উপদেশাদি দেওযাতেই তাঁর দিন যায়। বই বিক্রীর হিসাব রাখা, বই ডাকে পাঠানো, ভি. পি করা, বইয়ের বিজ্ঞাপন বিলি করা সরকার মশাই ছাড়া এ সব কে করবে? আর হেমলতা মা তাঁদের দুজনের সেবাশুশ্রূষা এবং প্রয়োজন মত অভ্যাগতদের বিশ্রাম ও আহারাদির ব্যবস্থা করেন। তাঁদের নইলে ঠাকুরের একদণ্ডও চলে না। এই ভাবে যখন তিনি তসিলদার পরিবারেরই একজন হয়ে গেছেন, তখন সে পরিবারে যোগ দিলেন ব্রহ্মচারী চণ্ডীচৈতন্য বা চিদানন্দজী। তিনিই শ্রীশ্রীঠাকুরের আদি ব্রহ্মচারী সেবক।

উমাচরণবাবুদের সেবাযত্নে সন্তুষ্ট হলেও পরিব্রাজকের চিত্তে মায়ার বন্ধন ছিল না। কাজেই দুর্গাপুরে ছোট্ট একটি আশ্রম পত্তনের সুযোগ জুটতেই সরকার দম্পতিকে অকূলে ভাসিয়ে সেবক চিদানন্দকে নিয়ে নির্মম সন্ন্যাসী দুর্গাপুরে চলে গেলেন।

তিনি চলে যেতেই সস্ত্রীক সরকার মশাই দু'চোখেই অন্ধকার দেখেন। সেই আগের মত দিন কাটানো—কেবল কাছারির কাজকর্ম, জমিদারের খাজনা আদায়, প্রজাদের সঙ্গে বকাবকি—আর ভাল লাগে না উমাচরণ বাবুর। হেমলতা মায়ের অবস্থা আরো মর্মান্তিক। সেই প্রথম যেদিন পাদপদ্ম দুখানির দিকে চেয়েই মনপ্রাণ লুটিয়ে পড়েছিল দেবতার পায়ে, সেই মন কি আর সংসারে বসে? দুজনে পরামর্শ করে একমত হয়ে সর্বস্ব বিক্রী করে

টাকাকড়ি বাসনপত্র ও অলঙ্কারাদি নিয়ে চিরদিনের মত 'বেণুয়ার চর' ছেড়ে দুর্গাপুরে চলে এলেন।

'ঠাকুর আমরা আপনার দাসদাসী হয়ে বাকী জীবনটা আপনার সেবা নিয়েই আশ্রমে থাকব'—বলে স্বামী-স্ত্রী যখন সকাতরে আশ্রমবাসী হওয়ার প্রার্থনা জানালেন, ঠাকুর তাঁদের ফেরাতে পারলেন না। আজন্ম বৈরাগী কিন্তু ভালবাসার কাঙাল ঠাকুর নিগমানন্দ কি তাঁর জন্য যারা সর্বত্যাগী হয়েছে, তাঁদের ভক্তি অর্ঘ্য গ্রহণ না করে পারেন? কাজেই দুর্গাপুর আশ্রমে উমাচরণবাবু হলেন ম্যানেজার, আর হেমলতা মা সেবাব্রতে দীক্ষিতা আশ্রম সেবিকা। শ্রীশ্রীঠাকুর, কুমার চিদানন্দ ও সরকার মশাইয়ের অহোরাত্র পরিচর্য্যা করা ছাড়াও প্রতিদিন সমাগত অতিথি অভ্যাগতদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করাও তাঁর দায়।

সহজ জ্ঞানে শ্রীশ্রীঠাকুর নিঃসংশয়ে বুঝলেন আজন্ম ঘোরসংসারী ও বিষয়কর্মনিপুণ তহসিলদারের সর্বস্ব সমর্পণ করে এই বৈরাগী হওয়ার মূলে কিন্তু হেমলতার প্রভাবই মুখ্য। স্ত্রী যদি 'বিদ্যা-স্ত্রী' না হয়ে 'অবিদ্যা' হয় পুরুষের সাধ্য কি ভোগের পথ ছেড়ে ত্যাগের পথে পা বাড়ায়? সুতরাং হেমলতা মায়ের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা জন্মাল শ্রীশ্রীঠাকুরের। আশ্রম জীবনে স্বামী-স্ত্রীকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হবে—এই সর্ত্তে উমাচরণবাবুদের অন্তেবাসী হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। স্বামীকে এই ব্রত পালনে বাধ্য করাও পত্নীর দায়িত্ব—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সদ্‌গুরু দেখেন হেমলতা সে দায়িত্ব নিষ্ঠাভরে গ্রহণ করেছেন।

তারপর নিজের হাতে গড়া স্বচ্ছল সুখের সংসার ছেড়ে দুর্গাপুর আশ্রমের খড়ের চাল, বাঁশের বেড়া-ঘেরা দুখানি মাটির ঘরের ছোট্ট আশ্রমে অভাব-অনটন ও অগণিত অসুবিধা সহ্য করে হেমলতা মা যেরকম প্রসন্ন মুখে আত্মসুখ-বিরহিতা হয়ে তপস্বিনীর মত কায়মনোবাক্যে আশ্রম সেবায় নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিতে লাগলেন, তাতে পরমহংস নিগমানন্দদেবের

বিচারে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সন্ন্যাসের যোগ্যপাত্রী বলে চিহ্নিত হলেন। কিন্তু নিজে কোন গুরুতর দায় নিতে তখনও ঠাকুর রাজি ছিলেন না। তার কারণ মূলত গুরু হওয়াটাই তাঁর কাম্য ছিল না। যারা জানে না "গুরু" কি, সেই অতি বড মূর্খরাই সামান্য পূজা পেলেই 'গুরু' সেজে বসতে চায়। আর যাঁরা গুরুর গুরুত্ব কি তা সম্যক অবগত হন, তাঁরা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের মতই সভয়ে বলেন, 'আমি গুরু নই। গুরু হলে শিষ্যের পাপ-তাপ নিতে হয়। গুরু, কর্তা, বাবা—এই তিন কথায় আমার গায়ে (যেন) কাঁটা বেঁধে।' শ্রীশ্রীঠাকুর জানতেন গুরু হওয়ার কি মহা বিড়ম্বনা। তাই সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় গুরু-দত্ত মহাভার গ্রহণ করলেও সহজে নিজের বোঝা বাড়াতে তাঁর ইচ্ছা হত না। হেমলতা মাকে সন্ন্যাসলাভের যোগ্য-পাত্রী মনে হলেও তিনি নিষ্ক্রিয় হয়েই রইলেন। সুতরাং "লীলা নাটক সূত্র ধারণকরী"র আসন অটল। গারোহিল যোগাশ্রমে ভাববিভোর উদাসীনকে যিনি অনেক অনুনয় করে বলেছিলেন—'আমাদের ছেলে মেয়েদের স্বধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না? আর কতকাল তাদের ভুলে থাকবে? তুমি না গুরু? তুমি ছাড়া কে ওদের ঘুম ভাঙিয়ে বুঝিয়ে দেবে কে ওরা, কোথায় ওদের নিজের ঘর।'—দুর্গাপুর আশ্রমেও তিনিই একদিন দেখা দিয়ে বললেন—'হেমলতাকে সন্ন্যাস দিচ্ছ না কেন?' যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ঠাকুর মহারাজের সমগ্র জীবন অনুধ্যান করেছেন তাঁরাই জানেন, নিস্ত্রৈগুণ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েও ঋষি প্রদর্শিত শীল ও সদাচার বিধি শ্রী নিগমানন্দদেব অকারণে কখনও লঙ্ঘন করেন নি। সাধন ও সিদ্ধজীবনে সত্ত্ব প্রধান আর্যবিধিরই প্রাধান্য ছিল। সুতরাং শংকর পন্থী সন্ন্যাসী হয়ে একটি মেয়েকে সন্ন্যাসের অধিকার দেবেন কিনা, এ নিয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল। তাই শঙ্কটনাশিনীকে প্রত্যক্ষীভূতা হয়ে স্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করতে হল—'হেমলতাকে সন্ন্যাস দিচ্ছ না কেন?' শ্রীশ্রীঠাকুর সদ্গুরু, মাহেশ্বরীর ভর্তা তিনি। সোজাসুজি অনুজ্ঞা করা চলে না বলেই কৌশলে কথা বলা। ওই প্রশ্নটি তাঁর প্রত্যাদেশ। ঠাকুর বুঝলেন, দেবীর অবশ্যই কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে। হেমলতার

সন্ন্যাস গ্রহণ তাঁর অভিপ্রেত। সাধারণ মেয়ে সে নয়—তা হলে কি আর স্বভাবে সংসারাসক্ত নারীজাতির একজন হয়ে প্রৌঢ়া বয়সে ঘর সংসার সুখ-সুবিধার এত সহজে জলাঞ্জলি দিতে পারে?

১৩১৪ সালের পৌষ অমাবস্যায় হেমলতা মাকে যথাশাস্ত্র অবধূত সন্ন্যাস বা ভৈরবী ভেক দিলেন ঠাকুর মহারাজ। প্রকোষ্ঠের শঙ্খ-বলয় ও সীমন্তের সিঁন্দুর বাঙালী হিন্দু মেয়ের আয়তি চিহ্ন। নিজের হাতে শাঁখা ভেঙে সিঁথির সিঁন্দুর মুছে ফেলতে হল শ্রীগুরুর আদেশে। তারপর ললাটে বৃহৎ সিঁন্দুর বিন্দু, পরিধানে গুরুদত্ত গৈরিক, গলে রুদ্রাক্ষমালা এবং দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ধারণ করে অবধূতী ঠাকুর মহারাজের মুখে মহাবাক্য শ্রবণ করলেন। তার মর্মার্থ ঠাকুর স্বয়ং যখন ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন, এমন সময় সবিস্ময়ে দেখলেন নবদীক্ষিতা সন্ন্যাসিনীর অদূরে হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়েছেন আমাদের মা-ঠাকুরাণী। পর মুহূর্তে পরমেশ্বরী এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করলেন ভৈরবী-মাকে। অমনি সংজ্ঞা হারিয়ে ভৈরবী মায়ের শিথিল দেহ গুরু-পাদপদ্মে লুটিয়ে পড়ল। মহোল্লাসে পরমহংস নিগমানন্দদেব দেখলেন সাধ্বী হেমলতার স্থূল আধারাবলম্বনে স্বয়ং মহাদেবী তাঁর মনোময়ী মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়েছেন।

গারোহিল যোগাশ্রমে আমাদের ঠাকুর ও মা-ঠাকুরাণীর যে দিব্য নিভৃতালাপ স্মরণ করে ওড়িশার ভক্তকবি শ্রদ্ধেয় গুরুভাই ঈশ্বর সাহু একদা ভাবতন্ময়-চিত্তে অনবদ্য ভাষায় লিখেছিলেন—'গুরুগিরির জন্য এই প্রেমরাজ্য ছেড়ে লোকালয়ে যেতে হবে শুনে ক্ষুব্ধ-চিত্তে ঠাকুর যখন জানতে চাইলেন, প্রকটবিগ্রহে তোমায় দেখা কি তবে এখানেই শেষ হল?'

"এহি ভাবে তুমকু মু পাইবি কি নাহিঁ?
কহন্তি জননী, ন পাইব কাঁহি পাই?
সতী সাধ্বী পতিব্রতা শিষ্যাঙ্ক ভিতরে—
পাইব এই প্রেম তার বিমল অন্তরে।

পাইব যোতে পতিব্রতা শিষ্যা অন্তরগতে—
পাইব এ প্রেমভাব, মো রূপ ফুটি উঠিব।"

নিগমলহরী পৃঃ ১৭৮

এতদিনে মা-ঠাকুরাণী তাঁর সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার যোগ্য আধার পেয়েছেন—ঠাকুরের তা আর বুঝতে বাকী থাকে না। হেমলতা মা-ই সেই সতী সাধ্বী পতিব্রতা।

কিছুক্ষণ পরে ভৈরবী মায়ের সংজ্ঞা ফিরল। অজ্ঞাত এক আনন্দে তাঁর হৃদয় তখন কানায় কানায় ভরা। অন্তরে কি যেন এক অনির্বচনীয় শান্তি ও পূর্ণতাবোধের তরঙ্গ উঠছে। তিনি উঠে বসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"আজ হতে তোমার স্বরূপ 'যোগমায়া'। হেমলতার মৃত্যু হয়েছে জানবে।" তারপর সাধন কৌশলাদি শিখিয়ে দিয়ে ঠাকুর তাঁকে নিয়মিত সাধন-ভজনে ব্রতী করালেন। বার বার সকৃতজ্ঞ চিত্তে গুরুদেবকে প্রণাম করে ভৈরবী মা নব-জীবনে প্রবেশ করলেন সেইদিন হতে। উমাচরণ সরকারের সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হ'ল।

হেমলতা মাকে সন্ন্যাস দেওয়ার একটা গৌণ প্রয়োজনও ছিল-ঠাকুর নিগমানন্দ ছিলেন শাস্ত্রমূর্তি। তাঁর জ্ঞানীগুরু সচ্চিদানন্দজী তাঁকে শিখিয়েছিলেন, বৈদিক সন্ন্যাসী পরমহংসত্ব লাভ করে ত্রিগুণাতীত ভূমিতে অবস্থান করলেও লোকশিক্ষার প্রয়োজনে তাঁকে যথাসম্ভব বৈদিক বর্ণাশ্রম বিধি পালন করতে হয়। দুর্গাপুরে আশ্রম হওয়ায় সমাজের উচ্চনীচ সকল বর্ণের লোকই অতিথি হবে। সেক্ষেত্রে আশ্রমের ভোগপাক ইত্যাদি ব্রাহ্মণ সেবকেরই করার কথা। তবে চতুর্থাশ্রমী সকলের পূজ্য। তিনি পূর্বাশ্রমে যাই থাকুন না কেন, তাঁর হাতে খেতে কারও বাধা নাই। এজন্যও আশ্রমসেবিকা হেমলতা মায়ের সন্ন্যাস গ্রহণ নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। এবার তিনি সন্ন্যাসিনী। কাজেই ঠাকুর নিশ্চিন্ত মনে তাঁর হাতে ঠাকুরভোগ পাককরা হতে আরম্ভ করে গুরুব্রহ্মের আসনে পূজা করা ইত্যাদি সব ভারই ছেড়ে দিলেন। ব্রহ্মচারী চিদানন্দ

হলেন ভৈরবী মায়ের আজ্ঞাবহ। সরকার মশাই বাণপ্রস্থী গৃহীর মত আশ্রমের অনুগত সেবক।

সব কাজ শেষ হলে রাত্রির নিভৃতে ভৈরবী মা আসনঘরে বসে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশানুযায়ী নিয়মিত জপ-ধ্যান করেন। অল্প দিনের মধ্যেই সাধনার সিদ্ধি করায়ত্ত হ'ল তাঁর। জপ করতে করতে কখন যে ভৈরবী মায়ের বাহ্য-চেতনা প্রগাঢ় ধ্যান-চেতনায় হারিয়ে যেত তা তিনি জানতে পারতেন না। এক অপার্থিব আনন্দানুভবে তাঁর আমিত্ব লোপ পেত 'অপার সংবিত সুখসাগরে'। গুরুব্রহ্মের ছোট্ট আসন-ঘরখানি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠত তাঁর দেহ-নিঃসৃত আলোক প্রভায়। যোগমায়া দেবী তার কিছুই জানতেন না।

দুর্গাপুর দেওয়ান বাড়ীর জয়চন্দ্র বিশ্বাস ঠাকুর মহারাজের পরম ভক্ত ছিলেন। একদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর শেষে ঘরের দরজা খুলে প্রস্রাব করতে ঘরের বাইরে এসেছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি, একি! এ কিসের আলো? অন্ধকার রাত্রে তার আভায় গাছ-পালা ঘর-বাড়ীর গায়ে ফিকে চাঁদের আলোর মত ছড়িয়ে পড়েছে যেন। অনুসন্ধিৎসু হয়ে এদিক ওদিক চাইতে না চাইতেই চোখে পড়ল—অদূরে শান্তি আশ্রমের আসন-ঘরের উপরে বিজলী ঝলকের মত প্রায় এক হাত দীর্ঘ এক জ্যোতিশিখা অকম্প দীপ্তিতে জ্বলছে আকাশ পটে। কয়েক মুহূর্ত—তারপরই হঠাৎ নিভে গেল যেন, অন্ধকারে ছেয়ে গেল দশদিক। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে দেন জয়চন্দ্র দাদা। মনে বোঝেন, এ ঠাকুরেরই কোন লীলা হবে। তিন চারদিন কেটে গেল তারপর। খুব ইচ্ছা সত্বেও ঠাকুর মহারাজকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহসে কুলায় না। রাত্রে উঠে ওই দৃশ্য দেখাও যদি কোন অপরাধ হয়, ওদিকে কৌতূহলেরও অন্ত নাই। নিজের চোখে অমন আশ্চর্য্য একটা দেখেছেন সে রাত্রে। ব্যাপারটা কি, না বুঝলে শান্তি নাই প্রাণে।

তিন চারদিন পরে একরাত্রে ইচ্ছা করে জয়চন্দ্র দাদা জেগে থাকেন। সেদিন ঘুম চোখে উঠে মনের ভুলে কিছু কি দেখেছি? বিছানায় ঘুমের ভানে জেগে থাকেন। যথাসময়ে পল্লী নিস্তব্ধ হয়ে গেল, কর্মশ্রান্ত পত্নী ঘরে এসে খিল দিয়ে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন স্বামীর পাশে। চরাচর সুপ্তি মগ্ন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রহর পার হতেই সতর্ক প্রহরীর মত চারিদিকে নিশা-রব ধ্বনিত হয়—'হুক্কা হুয়া-য়া'। ঘোর নাদে প্রকৃতির বিশ্বস্ত ভৃত্যরা প্রহর ঘোষণা করে। আগের দিনও শিয়ালের ডাকেই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল জয়চন্দ্র বিশ্বাসের। অনেকেরই ভাঙ্গে। পাছে অন্য কেউ কোথাও উঠে থাকে, যদি ঠাকুরই স্বয়ং বার হয়ে থাকেন আশ্রমে? ভয়ে আরও কিছু সময় চুপচাপ শুয়ে থাকেন তিনি। আবার চতুর্দিক নিশুতি হয়ে যায়। তখন পা টিপে টিপে উঠে সাবধানে ঘরের খিল খুলে বাইরে এসে দাঁড়ান। সেই একই দৃশ্য। আজ আরও উজ্জ্বল, আরও দীর্ঘায়িত হয়েছে সেই আলোকশিখা। ঠিক আসন-ঘরের উপরে স্থির সৌদামিনীর মত প্রভা বিকীর্ণ করছে দিব্য-জ্যোতি। জয়চন্দ্র দাদা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে প্রণাম করেন করজোড়ে—কিন্তু কই? মায়া-মরীচিকার মতই মিলিয়ে গেছে সেই ক্ষণপ্রভা। আর তা নাই, চারিদিক অন্ধকার। গভীর নিশীথের গাঢ় তমিস্রায় থমথম করছে দিক্‌দেশ। বিশ্বাস দাদার বুঝতে বাকী থাকে না পরমহংস নিগমানন্দদেবের কৃপায় অলৌকিক কিছু প্রত্যক্ষ করছেন তিনি। আজ তো আর ঘুমচোখে উঠে আসেন নি।

কয়েকদিন পরে ঠাকুরকে নির্জনে পেয়ে ঘটনাটি বলে প্রশ্ন করলেন, 'ওকি দেখলাম ঠাকুর? গুরুব্রহ্মের দিব্য-জ্যোতিই কি আপনার কৃপায় চর্মচক্ষে দর্শন? শ্রীশ্রীঠাকুর একটু নীরব থেকে বললেন, 'মহানিশায়—(রাত্রি দুই প্রহরের পরে বিশেষ একটি সময়ের তন্ত্রোক্ত পরিভাষা মহানিশা) আত্ম-বিচ্ছুরণ হয় তোমাদের ভৈরবীমায়ের। রাত্রে সে গুরুব্রহ্মের আসন সম্মুখে বসে জপাদি করে কিনা। ওটি তার সাধন সিদ্ধির সংকেত। বাইরে এই কথা প্রচার ক'রনা যেন। তাতে তোমারই হানি

হবে।' সভয় শ্রদ্ধায় তখনই ভৈরবী মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আসেন বিশ্বাসমশাই। মা তা হ'লে এরই মধ্যে সিদ্ধ-যোগিনী হতে চলেছেন? তা আর না হবে কেন? সদ্‌গুরু নিগমানন্দ অত বড় যোগীপুরুষ। তিনি যাঁকে সন্ন্যাস দিয়েছেন তাঁর সাধন বল কি সাধারণ নাকি?*

এ রহস্যের আদ্যন্ত কেবল স্বয়ং ঠাকুর ছাড়া অন্য কেউ জানত না। নারীর স্বামী সেবাই গুরুসেবা, মানব ধর্মশাস্ত্রের বিধান। হেমলতা মা আজীবন সেই স্বামী সেবায় কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পতিব্রতা বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর মহিলা। স্বপ্নেও স্বামী ছাড়া আর কাউকে মনে স্থান দেন নাই। শুধু এবার নয়, হয়তো জন্মজন্মান্তর একই সাধনায় সিদ্ধা তিনি। তাই সংসার ভোগের কাল পূর্ণ হওয়া মাত্র প্রাকৃতিক নিয়মে অধ্যাত্ম রাজ্যের দুয়ার খুলে গেল। সাধনে ঘরে এলেন সকল সাধনার সারাৎসার সদ্‌গুরু। অমনি সাধ্বী হেমলতার অনাবিল শুদ্ধ হৃদয়ে সহজেই প্রতিফলিত হল তাঁর মহিমা। বিভূতি দেখেও নয়, ঠাকুরের রূপ দেখেও নয়—কেবল পাদপদ্ম দুটী দেখেই যেন অতীন্দ্রিয় দর্শন হল। তত্ত্ব না বুঝে, সত্য না জেনে, গুরুর শ্রীচরণকমলে মগ্ন হ'ল তাঁর চিত্তভৃঙ্গ। যাঁর সামনেও বার হতেন না, প্রথম দিন সামনে এসেই পা দু'খানির দিকে চেয়ে হেমলতা মায়ের কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার অসামান্য ব্যঞ্জনা যাঁরা হৃদয়ে অনুভব করতে না পারবেন, তাঁরা কিছুতেই বুঝতে পারবেন না কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করা মাত্র জগদীশ্বরী ভৈরবীমায়ের মধ্যে আবিষ্টা হয়েছিলেন। যিনি শিবের সতী, তিনি পতিপ্রাণা নারীকে সহজেই কৃপা করেন—ভালবাসেন। শাস্ত্রে আছে—মহামায়া আমাদের মোক্ষদ্বার রুদ্ধ করে রেখেছেন। 'সৈষ প্রসন্না বরদা নৃনাং ভবতি মুক্তয়ে'—তিনি প্রসন্ন না হলে মুক্তিমার্গ উদ্‌ঘাটিত হয় না। নারীর স্বামী-সেবা তাঁকে প্রসন্ন করার সর্বপ্রধান পথ। হেমলতা-মা এই পথের যাত্রী বলেই বিনা সাধন ভজনে জগন্মাতা তাঁর চোখ খুলে

২

* দ্রষ্টব্য—স্বামী যোগানন্দ প্রণীত 'স্মৃতিকথা'। আর্যদর্পণ

দিলেন। দেখা মাত্র সদ্‌গুরুকে চিনতে পেরে বয়ঃজ্যেষ্ঠা শুদ্ধ-স্বভাবা হেমলতা-মা দাসীর মত তাঁর সেবা পরিচর্যায় উৎসর্গ করলেন আপনাকে। সংসার বন্ধন পলকে ছুটে গেল।

তারপর সন্ন্যাস গ্রহণান্তে গুরুদত্ত সাধন প্রণালী অবলম্বনে সামান্য ক্রিয়াদি করতেই অবশিষ্ট চিত্ত-মালিন্যও দূর হ'য়ে গেল। যোগমায়াদেবীর পূতদেহে আমাদের মা-ঠাকুরাণী অষ্টপ্রহর বিরাজ করতে লাগলেন। তার একটা বহির্লক্ষণ হ'ল, ভৈরবী মা ভেক গ্রহণের পরেই মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়স হ'তে যোগমায়াদেবী আর রজঃস্বলা হননি। তিনি অসামান্যা স্বাস্থ্যবতী অথচ নিঃসন্তান মহিলা। অত অল্প বয়সে তাঁর আর ঋতুমতী না হওয়া প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। কিন্তু পরমেশ্বরী সুপ্রসন্না থাকলে জগতে সবই সম্ভব। একদিনের জন্যও যেন ভৈরবীমায়ের গুরুসেবায় বাধা না পড়ে এবং মহাদেবী স্বয়ং যে-দেহ আশ্রয় ক'রে স্থূলে প্রকটিতা হয়েছেন তার সাময়িক অশুচিতাও অসম্ভব—এই দু'টী তত্ত্ব ভক্ত-সন্তানদের বোঝাবার জন্য যোগমায়াদেবীর দেহে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছিল।

গারোহিল যোগাশ্রমে বৈদেহী মা-ঠাকুরাণী আমাদের ঠাকুরমহারাজকে বলেছিলেন—'তোমায় সেবা করে আমার আশা মেটেনি। কোনও শুদ্ধ আধার পেলে সেই দেহে আবিষ্ট হয়ে স্থূল জগতে তোমায় কিছুদিন সেবা করতে চাই। লোকালয়ে তোমাকে পাঠাবার সেও একটি কারণ।' আগেই বলেছি, সন্ন্যাস দান করার সঙ্গে সঙ্গে মহাদেবী এসে ভৈরবী মাকে জড়িয়ে ধরেছেন দেখেই ঠাকুর বুঝেছিলেন সাধ্বী হেমলতাই সেই দেবী নির্বাচিতা শুদ্ধ আধার। তাই সন্ন্যাসিনীর স্বরূপ বলে দিলেন 'যোগমায়া' অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি। আট বৎসর কাল যোগমায়ার দেহাবলম্বনে 'প্রত্যক্ষ মাহেশ্বরী' ঠাকুর মহারাজের সেবা সম্পাদন করেছেন। লোকে ভৈরবী মাকেই দেখত, কিন্তু মহাযোগেশ্বর শ্রীনিগমানন্দ মানবীকে দেখতে পেতেন না, তাঁর দৃষ্টিতে যোগমায়াদেবী সর্বক্ষণ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী রূপে

প্রতিভাত হতেন। এইজন্য হেমলতা মা ভৈরবী ভেক গ্রহণের পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সকল সেবার ভার পেয়েছিলেন। তার আগে পর্য্যন্ত তেল মাখানো, স্নানাদিতে সাহায্য করা, জটা পাকিয়ে দেওয়া বা অঙ্গ সংবাহনাদি সাক্ষাৎ সেবা ব্রহ্মচারী চিদানন্দই করতেন। হেমলতা মা চারবেলা ভোগের ব্যবস্থা করতেন, সামনে বসে খাওয়াতেন—বিছানা করা, জামা, জুতো, কাপড়, চাদর গুছিয়ে দেওয়া, পান সাজা ইত্যাদি ও সকল সেবায় চিদানন্দজীর সহায়তা করতেন মাত্র। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের পর সে-দূরত্ব আর রইল না। ঠাকুর মহারাজের সর্ববিধ সেবা যোগমায়া দেবী স্বয়ং সুসম্পন্ন করতে আরম্ভ করলেন। পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীঠাকুর যে বলতেন, 'আমার এই দেহটাও যোগমায়ার হাতে গড়া', দুর্গাপুর আশ্রমে হেমলতা মা সন্ন্যাসিনী হওয়ার পরই তার সূত্রপাত। বাইরের লোকে যে যা ইচ্ছা ভাবলেও, নিস্ত্রৈগুণ্যে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর নিগমানন্দ তা সর্বক্ষেত্রে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না। তিনি যখন স্বচক্ষে দেখছেন মাহেশ্বরী ওই দেহে সাক্ষাৎ ভাবে তাঁর সেবা করতে উৎসুক, তখন কি ইতর সাধারণের সমালোচনায় তিনি পিছিয়ে যাবেন? বিনা দ্বিধায় ঠাকুর মহারাজ শিশুর মত নিজেকে যোগমায়া দেবীর হাতে সঁপে দিলেন।

এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের পরম ভক্ত সুরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের ভৈরবী মাকে প্রথম দর্শনের কথাটি উল্লেখযোগ্য। ১৩১৮ সালের পৌষ মাসে তিনি ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে দীক্ষা নিতে আসেন। দীক্ষা গ্রহণের পর সন্ধ্যায় যখন তিনি অন্যান্য ভক্ত সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বসে উপদেশ শুনছেন, এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী এসে ঠাকুরের হাতে পান দিতেই তিনি বলে উঠলেন 'তুই কেন রে? মা কৈ?' ব্রহ্মচারী বললেন 'মা ভিতরে আছেন।' অমনি ঠাকুর মুক্তকণ্ঠে ডাকলেন 'মা মা তুমি ওখানে কেন আমার কাছে এস।'

সুরেন দাদা সবিস্ময়ে ভাবছেন মা কে? এমন সময় লালপাড় গেরুয়া

শাড়ী পরা ভৈরবী মা সসঙ্কোচে সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। মা আসতেই ঠাকুর শিশুর মত আবদার করে বললেন, 'তুমি আমার মুখে পান দিয়ে দাও না। আমি তোমার হাতে খাব।' যোগমায়া দেবীকে অগত্যা তাই করতে হয়। নতুবা এই ভাবের পাগল কি করে তার স্থিরতা নাই। ঠাকুর তখন ভৈরবী মাকে বললেন, 'ওকে (অর্থাৎ সুরেন দাদাকে) তোমার লজ্জা কি ? ও যে আমার ছেলে।' তাঁর এই কথা শুনে মা একবার করুণামাখা দৃষ্টিতে ঠাকুরের নূতন ছেলেটির দিকে চেয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

সুরেনদা লিখেছেন, 'আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই মহীয়সী রমণী মূর্তি দেখিতেছিলাম, আর দেখিতেছিলাম গুরুগম্ভীর যোগীর শিশুর মত ভাব। পরে তিনি অন্তেবাসিদের কাছে যোগমায়াদেবীর পরিচয় পেলেন। ভৈরবী মা ঠাকুরের সর্বপ্রথম সন্ন্যাসিনী শিষ্যা। এই প্রৌঢ়াই একাধারে জননী, ভগিনী ও সেবিকার মত শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্ববিধ সেবা শুশ্রূষা সম্পন্ন করেন।

ঠাকুর মহারাজের অতীন্দ্রিয় দর্শন অবিশ্বাস করেন সংসারে এমন লোকের অভাব নাই। তাঁদের জন্য যে দুই-তিন জন ভৈরবী মায়ের অলৌকিক মহিমা দর্শন করেছেন সেই সব প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা এবার বিবৃত করছি।

১৩১৪ সালে দুর্গাপুর আশ্রমে যে সব ভক্তশিষ্য আসতেন, যোগেশ্বর গাঙ্গুলী তাঁদের অন্যতম। তিনি লিখেছেন, 'প্রথমদিকে আশ্রমে লোকসমাগম বেশী ছিল না। তাই উৎসবাদি উপলক্ষ্যে আশ্রমের একমাত্র রন্ধনপাত্র একটি দেড়সেরী বোকনাতে (পিতলের তৈয়ারি এক বিশেষ গঠনের হাঁড়ি) খিচুড়ি রেঁধে মা গুরুব্রহ্মের আসনে ভোগ দিতেন। দ্বিতীয়বার এক বোকনা খিচুড়ি বসাবার প্রয়োজন হ'ত না। ওই এক হাঁড়ি খিচুড়ীতেই প্রসাদার্থীদের পূর্ণমাত্রায় আহার সম্পন্ন হত। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল, আশ্রমের উৎসব পর্বে লোকসমাগমও বাড়ল। প্রথমদিকে দশ বার জন লোক হত। ক্রমে তার সংখ্যা চল্লিশ পঞ্চাশ কি তারও বেশী হতে লাগল। কিন্তু ভৈরবী মাকে দ্বিতীয়বার আর খিচুড়ি বসাতে কখনও দেখিনি।

প্রথমেও যে দেড়সেরী বোকনা, পরেও সেই দেড়সেরী পাত্রের খিচুড়িতেই প্রসাদ বিতরণ সুসম্পন্ন হ'ত—যোগেশ্বরদার ভাষায় "বোকনা হইতে প্রসাদ উঠাইয়া পরিবেশন করা হইতেছে, আবার পরিবেশন করা হইতেছে। এইরূপে সর্বশেষে যে লোকটি প্রসাদ পাইল, তাহার পর বোকনায় আর কিছুই রহিল না। দু'চারজন শিষ্য যাহারা পরিবেশন করিত কেবল তাহারাই এই অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিত॥ কিন্তু তাহাও খেয়ালে আসিত কার্য্য নির্বাহের পর। প্রসাদ ভোজন ও পরিবেশন কালে আনন্দের উন্মত্ততায় মশগুল থাকায় পরিবেশনকারীদিগের সেদিকে লক্ষ্য থাকিত না। কার্য্যশেষে মনে হইত ওই একই হাঁড়ি হইতে প্রসাদ এত লোককে দিলাম ইহা কিরূপে সম্ভব হইল ?"*

যোগেশ্বরদা বলেছেন, ভৈরবীমায়ের মধ্যে যে স্বয়ং জগদীশ্বরী অন্নপূর্ণা-রূপে আবিষ্টা হয়েছিলেন এটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ১৩১৫ সাল হ'তে ঠাকুরের কাছে একে একে যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ভক্ত ডাঃ নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়, ডাঃ রাজচন্দ্র ধর, উকিল যোগেন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা, প্রত্যেকেই ছিলেন পূর্বজন্মের শিষ্য সন্ততি, অন্তরঙ্গ পরিকর। এঁরা সবাই স্বয়ং ঠাকুরের মুখেই শুনেছিলেন, ভৈরবী যোগমায়ার দেহাশ্রয়ে 'কাশী-পুরাধীশ্বরী অন্নপূর্ণা' গুরুশক্তিরূপে প্রকটিতা হয়েছেন। সুতরাং মহামায়ার কৃপা পেতে হলে ঠাকুরের সন্তান যাঁরা, তাঁদের ভৈরবী মায়ের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে হবে। তাঁরা সবাই এজন্য সাক্ষাৎ জগদম্বা জ্ঞানে যোগমায়া দেবীকে ভক্তি অর্ঘ্য দিয়েছিলেন। মায়ের ঠাকুর সেবা দেখে এই সব গৃহী শিষ্য পরিবার সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে ভাবতেন এমন অতন্দ্র নিরলস সেবা কোনও মানবীর পক্ষে করা অসম্ভব।

যোগানন্দজী লিখেছেন, 'উৎসবাদিতে ভৈরবীমাতা পাত্র-পূর্ণ প্রসাদ হস্তে লইয়া ভক্তগণকে বিতরণার্থে যখন বসিতেন তখন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার ন্যায় প্রতিভাত হইতেন। মা অফুরন্ত পরিশ্রম করিয়া সহাস্য বদনে ঠাকুরের

সেবা করিতেন। অমন নিষ্ঠার সহিত ঠাকুর সেবা করিতে অন্য কাহাকেও দেখি নাই। ছুটিয়া ছুটিয়া সমস্ত কার্য্য একা করিতেন, আসন পূজাও তখন তিনি করিতেন। সর্বাবস্থায় তিনি অম্লান বদনা ও হাস্যমুখী থাকিতেন।" যোগানন্দজী স্বয়ং ভৈরবী মায়ের যে অলৌকিক বিভূতি দেখেছিলেন যথাস্থানে তা বলব।

ভৈরবী মা তখন দেখ্‌তে কেমন ছিলেন? মা সুরবালাদেবীর মুখে শুনেছি যোগমায়াদেবীর বর্ণ ছিল গৌর, স্বাস্থ্যবতী সুগঠনা, বিগ্রহটি উচ্চতায় মধ্যমাকৃতি। চোখ দুটিতে আশ্চর্য্য এক দীপ্তির সঙ্গে করুণামাখা। কখনও তা মাতৃভাবে স্নিগ্ধ কোমল মনে হত; কখনও বা ঈশ্বরীভাবে রুক্ষ-কঠোর। তাঁকে দেখলেই আপনা হতে একটা ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম জাগত মনে—এক কথায় এই হল তাঁর আকৃতির বৈশিষ্ট্য। সবচেয়ে দেখার জিনিষ ছিল ভৈরবী মায়ের মাথার চুল। নিতম্ব চুম্বিত বিপুল কুন্তল ভারে সূর্য্যের আলো পড়লেই কেমন যেন নীল রেশমের মত অদ্ভুত একটি আভা খেলত। সুরবালাদেবী বলেছেন এ জীবনে কোনও মহিলার কেশরাজিতে সূর্য্যালোকে অমন নীল রং খেলতে তিনি আর দেখেন নাই। নিশ্চয়ই ইহা একটি দেবী লক্ষণ। স্বভাবে মা মিতভাষিণী ও গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন। বেশীর ভাগ সময় আপন মনে ঠাকুর সেবার কাজেই ব্যাপৃত থাকতে ভাল-বাসতেন। আসাম মঠে যাওয়ার পর যোগমায়া দেবীর সেই অহোরাত্র ব্যাপী ঠাকুর সেবা সুরবালাদেবী নিজের চোখে দেখেছিলেন। পরে তা বলা যাবে।

কিন্তু গুরুসেবাপরায়ণা সুশীলা যোগিনী হলে কি হবে? "লীলা নাটক সূত্র ধারণকরী" যিনি তিনি তো সহজ পাত্রী নন্। তাঁর মহামায়ার কুহকে পরমহংসদেরও ঐশী শক্তি স্তিমিত হয়, যোগসৃষ্টি আবৃত হয় অতর্কিতে। তিনি কি ভৈরবী মাকে নিষ্কৃতি দেবেন বিনা আপত্তিতে? তাই যোগমায়া দেবীর শান্ত সদানন্দময় জীবন যাত্রায় এক মহা সংকট দেখা দিল।

১৩১৭ সালে একদল শিষ্য-শিষ্যাসহ শ্রীশ্রীঠাকুর তীর্থ ভ্রমণে রওনা হলেন, যোগমায়াদেবীকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আশ্রমের ভার রইল বৃদ্ধ উমাচরণ সরকার ও কামিনীকুমার নামে নবাগত এক ব্রহ্মচারীর হাতে। শ্রীগুরুর অনুপস্থিতির সুযোগে মহামায়ার ঘোর অবিদ্যা চাতুরীতে সরকার মশাইয়ের বুদ্ধি বিভ্রম হল। দুষ্ট লোকের মন্দ প্ররোচনায় ঠাকুর মহারাজের উপর তাঁর অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস এল। নবাগত ব্রহ্মচারীটির সহায়তায় দুর্গাপুর আশ্রম লুট করে টাকাকড়ি তৈজস ও আসবাবাদি সব নিয়ে উমাচরণবাবু পালিয়ে গেলেন নিজের ভাইয়ের কাছে। কোথায় গেল তাঁর সেই ভক্তি বিশ্বাস, সেই গুরু পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণের শুভ বুদ্ধি ?

অথচ এটাও ভাববার কথা যে, তিনি যদি নিতান্তই ঘোর বিষয়ী ও পাকা সংসারী হতেন তাহলে পত্নী যতই বোঝান না কেন, সরকার মশাই কখনও সর্ব্বস্ব বিক্রী করে সম্পত্তি ও ধর্ম্মপত্নী—সব গুরু সেবায় অর্পণ করে আশ্রমবাসী হতে পারতেন না। শুধু তাই নয়, তার ঐকান্তিক কর্ম্ম নিষ্ঠায় ঠাকুরমহারাজেরও অনেক পরিশ্রম লঘু হযেছিল। বিশ্বস্ত সেবকের মত উমাচরণবাবু আশ্রমের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা, বই ও পত্রিকার বৈষয়িক দায়-দায়িত্ব নিপুণ ভাবে সম্পন্ন করতেন। ক্রমে ঠাকুর সর্ব্ববিষয়ে অভিভাবকের মত তাঁকে নির্ভর করতেন। টাকাকড়ি সবই তো সরকার মশাইয়ের হাতে থাকত। এমন কি কোথায় ভ্রমণে যাওয়া হবে কি হবে না, তা-ও উমাচরণবাবুই ঠিক করে দিতেন। নৃপেনদা লিখেছেন, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে রাজফুলবাড়িয়ায় নিতে চাওয়ায় ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "কি তণ্ডুলদার মশাই! (তাঁকে এই নামেই ঠাকুর ডাকতেন বলে শিষ্য-ভক্তরা তাঁকে তণ্ডুলদার দাদা বলতেন) যাবে নাকি এদের দেশে" ? নৃপেনদা শুনেছিলেন এই বৃদ্ধই ঠাকুরের তত্ত্বাবধায়ক। এ জন্য আগেই তাঁকে বলে-কয়ে রেখেছিলেন। অতএব 'তণ্ডুলদার মশাই' বললেন "তা চলুন না কেন; নতুন দেশ দেখা হবে।" তিনি সম্মত হতেই ঠাকুর নৃপেনদাকে বললেন, 'তবে চল যাই, তুমি সব ব্যবস্থা কর।' সর্ব্ব ক্ষেত্রেই

এমনি হত। ময়মনসিংহে স্বরূপানন্দজীর বাড়ীতে যেবার প্রথম গেলেন তখন উমাচরণ সরকারই সর্বেসর্বা। ত্যাগ বৈরাগ্য এবং অকপট গুরুসেবার ফলে সরকার মশাইয়ের নানারকম অনুভূতি এবং অতীন্দ্রিয় দর্শনও হত। নৃপেনদা এরকম একটা ঘটনার কথা লিখেছেন। সেবারও উমাচরণবাবু ঠাকুরের ভ্রমণ সঙ্গী। হঠাৎ বৃদ্ধের জ্বর হল। সকলেই সেবা করছেন সাধ্যমত, ঠাকুর স্বয়ং তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন। এমন সময় একদিন জ্বরে অচেতন প্রায় সরকার মশাই বিছানা ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে উঠে এসে ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বাবা, আমি চিনেছি তুমি কে? কতবার কত রকমেই দেখা দিলে, তবু যে ভুলে যাই। সে নেহাৎ আমার ভাগ্য দোষে।' পরে তিনি নৃপেনদার কাছে বলেছিলেন, তাঁর চোখের সামনেই ঠাকুরের মূর্তি জ্যোতির্ময় দিব্য বিগ্রহে রূপান্তরিত হয়ে গেল, ইষ্ট দর্শন হল গুরু মূর্তিতে। তাই প্রথমেই বললাম এ কেবল মহামায়ার ছলনা। তাই তহশীলদার মশাই শেষে হয়ে দাঁড়ালেন গুরুস্বাপহারী মহাপাতকী। ভাগ্যহীন বৃদ্ধ সদ্‌গুরু পদাশ্রয় পেয়েও 'ঘোর কর্মে' লিপ্ত হতে বাধ্য হযে ঠাকুরের প্রচণ্ড মনস্তাপের নিমিত্ত হলেন। ভৈরবী মায়ের জীবনে দুরপনেয় অশান্তি ঘনিয়ে এল।

উমাচরণ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতায় স্বভাবসরল প্রেমের ঠাকুর শ্রীনিগমানন্দ যে মনে কত আঘাত পেয়েছিলেন, তা স্বরূপানন্দজীকে লেখা নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানায় চিরদিনের মত অবিস্মরণীয় হয়ে আছে—

পরম কল্যাণবরেষু ঢাকা
২৮।১।১১

রাজচন্দ্র......বৎস! একটা ঘটনাচক্র উপস্থিত করিয়া গুরু আমাকে শিষ্যদিগের হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। * * * * আমি জানিতাম সংসারে মায়িক সম্বন্ধ বুঝি স্বার্থময়, এখন দেখিলাম গুরু-শিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধও সেই ছায়ামাত্র। তবে সন্ন্যাসী হইয়া সংসারের

মায়ায় ঘুরিয়া মরি কেন? * * * * আমি শীঘ্রই চিরজীবনের মত তোমাদের চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যাইব; * * * পর কখনও আমার হইবে না। সুতরাং পুনরায় সন্ন্যাসী হইব। * * * * হায়। আমার নিঃস্বার্থ হৃদয়ভরা প্রেম কেহই লইল না। আমি যাচিয়া সাধিয়া লোককে দিতেছিলাম, তাই কি এত ঘৃণা, এত অনাদর করিল?……জগতে বুঝি এ জীবনে আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিব না।

চিঠিখানির ছত্রে ছত্রে প্রবঞ্চিতের অভিমান ঝরে পড়েছে। ভগবান জানেন সরকার-দম্পতিকে ঠাকুর একেবারেই ঘরছাড়া করতে চাননি। ব্রহ্মচারী চিদানন্দই তখন তাঁর মত কর্ম্মদক্ষ সবল মানুষের সহায় হিসাবে যথেষ্ট। বলতে গেলে, তাঁর অনুমতিটুকুও না নিয়ে এক রকম জোর করেই উমাচরণবাবু সর্বস্ব ঠাকুরকে দান করে সস্ত্রীক আশ্রমবাসী সেবক সেবিকা হয়েছিলেন। বিন্দুমাত্র দায় ব দোষ ঠাকুরকে কেউ দিতে পারবে না। আর সেই উমাচরণ সরকার শেষে আশ্রম লুট করে চোরের মত কেবল পালিয়ে যাননি, ঠাকুরের নিন্দা করে বেড়াচ্ছেন লোকের কাছে। যে দেওয়ান বাড়ীর লোকেরা হাজারবার চিঠি লিখে ঠাকুরকে আনিয়ে দুর্গাপুর আশ্রম গড়ে দিয়েছিল— ঠাকুর মহারাজ তাদের একটা মামলায় সাক্ষ্য দিতে রাজী না হওয়ায় তারা কিছুদিন হতেই নানা ভাবে ঠাকুরের সঙ্গে শত্রুতা করছিল। সরকার মশাই কিনা সেই দলে যোগ দিলেন। মর্মপীড়িত ঠাকুরের পক্ষে তাই লোকালয় ছেড়ে পরিব্রাজক হয়ে বন পাহাড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মাহেশ্বরী ছাড়লে তো?

ঘটনা শুনে বিচক্ষণ উকিল শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার (পরে স্বামী যোগানন্দজী) পুলিশের সাহায্য নিলেন। তাঁর তদ্বিরে অল্পদিনের মধ্যেই পলাতক সরকার মশাইকে ধরে কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে আনল পুলিশ দশ জনের মধ্যে। মান্য-গণ্য ভদ্রলোক উমাচরণবাবু চোরের মত হাতে হাত-কড়া বাঁধা অবস্থায় ঠাকুরের কাছে এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।

কুহকী মায়ার ছলনা যিনি সম্যক অবগত ছিলেন, জগদীশ্বরকে যিনি বলেছিলেন "great Hypnotiser" পরম ঐন্দ্রজালিক (নৃপেন্দ্র রায় কৃত "ভক্তজীবনী" দ্রষ্টব্য), সেই পরমহংস নিগমানন্দদেব সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীকে ক্ষমা করলেন। শরণাগত আর্তকে পায়ের কাছ থেকে টেনে তুলে সস্নেহে জড়িয়ে ধরলেন ঠাকুর, চোখের জলে তাঁরও বুক ভেসে গেল। গুরুর এই অশ্রুবারি তাঁর অপার করুণারই অভিব্যক্তি। উমাচরণবাবু জানেন না, কিন্তু ঠাকুর তো স্থির জেনেছিলেন ভাগ্যহীন এই শিষ্যটির কপালে অশেষ দুঃখ আছে। তিনি ক্ষমা করলে কি হবে ফলদাতার নির্ম্মম দণ্ড সরকার মশাই এড়াতে পারবেন না। তবু ভাল যে গুরুর কাছে ক্ষমা চাইবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে গুরুস্বাপহারীকে! এইটি উমাচরণবাবুর গুরুসেবার সামান্য পুরস্কার। আর সেজন্য গুরুভাই শ্রীযোগেন্দ্রনাথের কাছে তসিলদারমশাইয়ের চির কৃতজ্ঞ থাকার কথা। সংসারের বিচারে উকিল যোগেন্দ্রনাথ তাঁর মহাশত্রু হলেও অধ্যাত্ম বিচারে পরম মিত্র। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টাতেই সরকার মশাইকে পুলিশ তাড়াতাড়ি ধরতে পেরেছিল।

যাই হোক, গুরু-শিষ্যে তো বোঝাপড়া হল, এখন সমস্যা বাধল ভৈরবী মাকে নিয়ে। সরকার মশাই আর কেমন করে গুরুভাইদের মুখ দেখাবেন? আশ্রমে তিনি থাকতে পারবেন না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী? উমাচরণ বাবু আজ সর্ব্বহারা! নিঃসন্তান বৃদ্ধের একমাত্র অবলম্বন তাঁর ধর্ম্মপত্নী। সে ছাড়া এই অভাগাকে এক মুঠা ভাত রেঁধে দেওয়ার লোকও যে আজ নাই! আত্মীয় স্বজনরাই কি এমন অধর্মচারীকে ঠাঁই দেবে বা সম্মান দেখাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর যোগমায়া দেবীকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন 'তুমি এখন কি করবে? উমাচরণ বাবুর ইচ্ছা তোমাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের দেশে চলে যায়। আমার তাতে অমত নাই। তবে আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিয়েছি, তাই গুরু হিসাবে অধ্যাত্ম পথে স্ব-ইচ্ছায় চলবার স্বাধীনতাও দিচ্ছি। তুমি ওর সঙ্গেও যেতে পার, এখানেও থাকতে পার। কি করবে ভেবে

ঠিক কর।' ঘটনাচক্র কুটিলপথে গতি করতেই তিনি নিজ কর্তব্য কি তা ভেবে দেখেছেন। তাই ঠাকুরের প্রশ্নে একটুও দেরী না করে উত্তর দিলেন 'আমি সংসারে ফিরে যাব বলে তো দুর্গাপুরে আসিনি, ঠাকুর আপনি আমায় পায়ে ঠেলবেন না, আশ্রম ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।' কিন্তু 'যাব না' বললেই সমস্যা মেটে না। শ্রীনৃপেন রায়, যোগেশ্বরদা, শ্রীযতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা শ্রীরাজচন্দ্র ধর ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথের মত মাতৃভক্ত শিষ্যরা কেউই ভৈরবী মায়ের আর আশ্রমে থাকাটা সমর্থন করলেন না। সব চেয়ে আপত্তি তুললেন মানিকগঞ্জের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী কামাখ্যা প্রসন্ন রায়, তিনি ঠাকুরের পরম ভক্ত। কিন্তু তাঁর মতে ওই ভৈরবী মা তাঁর অকলঙ্ক পূর্ণশশী ঠাকুর মহারাজের একমাত্র কলঙ্ক।

এদিকে ভৈরবী মা তাঁর সঙ্গে যেতে অনিচ্ছুক শুনেই উমাচরণবাবুর আবার মতিচ্ছন্ন হল। রাগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে দুর্গাপুরে ঠাকুরের বিপক্ষ দলের পরামর্শ মত তিনি স্ত্রীকে ফিরে পাবার জন্য আদালতের সাহায্য নেবেন স্থির করলেন। সমাজ সংরক্ষক ঠাকুর মহারাজ এবার বিচলিত হলেন। আদালতে এসব কেলেঙ্কারি হলে তাঁর গুরু দত্ত ব্রত পালন হয় না। শান্তি আশ্রম কলঙ্ক কালি মেখে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করবে কোন মুখে। কাজেই ঠাকুর তখন নিজে ভৈরবী মাকে বললেন 'যোগমায়া! তুমি ওর সঙ্গে চলেই যাও। আশ্রমে আর তোমাকে রাখলে আমার সব কাজ পণ্ড হবে।' প্রশ্ন জাগে, ঠাকুর যে যোগমায়াদেবীর মধ্যে মহাদেবীকে প্রকটিতা দেখতেন তাহলে কি করে তাঁকে বিদায় দিচ্ছেন? উত্তর খুব সোজা। সত্যই যদি স্বয়ং পরমেশ্বরী ওই আধারে বিরাজিতা হয়ে ঠাকুর সেবা করতে চান—তাহলে ঠাকুর বললেই কি তিনি চলে যাবেন? গেলে যান, গুরু দত্ত মহাব্রতের চেয়ে তো আর দেবীর সেবা গ্রহণ বড় নয়। ঠাকুরের মতে এ ঘটনা ঠাকুরেরও গুরুনিষ্ঠার পরীক্ষা! লীলাময়ী দেখছেন কাকে ঠাকুর বেছে নেবেন? গুরুর দেওয়া অখণ্ডিত ব্রতপালন, না ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ? ঠাকুর অকুণ্ঠচিত্তে প্রথমটিই বেছে নিলেন। আমরা যখন পাই—

"ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে দয়াল গুরু এসেছে রে
জীবের তরে কেঁদে ফিরে প্রেম বিলায়রে যারে তারে"

কিম্বা যখন পড়ি—

'জীবের দুঃখ সইতে নারি ব্রহ্মানন্দ পরিহরি,
কেবা এমন জীবের লাগি দ্বারে দ্বারে ঘুরে,—"

তখন আমরা বুঝতে পারি, এসব কেবল ভক্তের ভাবোচ্ছ্বাস নয়। যোগানন্দ ও স্বরূপানন্দজীর পদগুলির পিছনে লুকানো আছে ঠাকুর মহারাজের গুরুভাবের বিপুল মহিমা। জীবোদ্ধারের জন্য কত ত্যাগ করতে ঠাকুর প্রস্তুত ছিলেন, তাঁরা দু'জনেই তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেযেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ শুনে চোখে অন্ধকার দেখে অনাথার মত কাঁদতে লাগলেন ভৈরবী মা। একি ভয়াবহ দুর্দৈব তাঁর? স্বামী তাঁর পক্ষে মৃত —সন্ন্যাসদানকালে গুরুই একথা বলেছেন। সন্তান কোন দিনই ছিল না। ত্রি-সংসারে আপন বলতে আছেন কেবল সদ্‌গুরু - এই শিক্ষাই কায়-মনো-বাক্যে গ্রহণ করেছেন গুরু বাক্য হ'তে। আজ সেই গুরু যদি বলেন "তুমি আমার পথের কাঁটা"—ভৈরবী যোগমায়াকে তো তাহলে তাঁর পথ ছেড়ে দিতেই হবে। যাঁর আদেশে ঘরছাড়া অবধূতী তিনি—তাঁর আদেশেই তাঁকে ছাড়তে হয় আজ। "হায়! তবে কার কাছে দাঁড়াব? আমার আর কে আছে?"

পরীক্ষা চলাছল মাতৃভক্ত সন্তানদেরও। সে পরীক্ষায় যাঁরা এই সময় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তাঁরাই ঠাকুরের স্বমুখে যোগমায়াদেবীর পরিচয় পেয়েছিলেন—যোগানন্দজী তাঁর "স্মৃতিকথায়" স্পষ্টাক্ষরে সে সব লিখে রেখে গেছেন। বলা বেশীর ভাগ। এই সন্তানদলের মধ্যে সর্ববরিষ্ট ছিলেন যোগানন্দজী স্বয়ং—১৩১৭ সালে যিনি উকিল যোগেন্দ্রসরকার, মায়ের চরম সংকটে যোগ্য সন্তানের মত তিনি তাঁর পরম সহায় হয়ে সান্ত্বনা দিলেন "মা তুমি কেঁদো না। আমি সরকার মশাইয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হওয়ার ব্যবস্থা করব। তোমার যা বলার আছে তুমি নিজেই তাঁকে বল

না মা। বুঝিয়ে দাও তোমার গুরুগৃহ ত্যাগ করা অসম্ভব। তাঁর সৎপরামর্শে অকূলে কূল পেয়ে প্রাণ খুলে যোগেনকে মা আশীর্বাদ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘটনাটা বুঝিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে উমাচরণ বাবুকে যোগেন্দ্রনাথ ডেকে আনলেন। নিরালায় দুই জনের দেখা হল। কোনও ভূমিকা না করে ভৈরবী মা স্থির স্বরে বললেন, 'যতদিন সংসারে ছিলাম তোমার ইচ্ছার কাছে সব বিষয়ে চিরকাল নিজের ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়েছি। এমন একটা ঘটনা বলতে পারবে না, যাতে আমি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করেছি। তারপর তোমারই অনুগ্রহে সদ্গুরু লাভ করেছি, তোমার সাধুতা ও সততায় তুষ্ট হয়েই আমাকেও তিনি কৃপা করেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতিও সানন্দে তুমিই দিযেছিলে—তা না হলে ঠাকুর কি আমায় কখনও সন্ন্যাস দিতেন? কিন্তু ভেবে দেখ, তার পর হতেই তোমার পথ আলাদা আমার পথ আলাদা হয়ে গেছে। আমি সন্ন্যাসিনী, সংসার সমাজ তো দূরের কথা—বিরজা হোম করে আমার 'আমিত্ব'ও গুরুপাদপদ্মে বিসর্জ্জন দিয়েছি। সুতরাং তুমি কেন, ঠাকুর যদি আজ আমায় ত্যাগ করেন, তাঁর আশ্রমে যদি স্থান না পাই তা হলেও কি আমি আর সংসারে ফিরতে পারি? তুমি নিষ্ঠাবান হিন্দু। সন্ন্যাসব্রত রক্ষা না করলে ভ্রষ্টাচারীর যে নরকেও স্থান হয় না তা কি শোননি? হিন্দু মেয়ের স্বামীই পরম গুরু। আমার মহাসৌভাগ্য, তুমি সংসার পথে সত্যই আমার গুরুর কাজ করেছ—নিজের যথাসর্বস্ব সহ আমাকেও উৎসর্গ করেছ ঠাকুরের পায়ে। তবে আজ তোমার এমন মতিচ্ছন্ন হল কেন? তুমি সরল মানুষ, যারা তোমায় বুদ্ধি পরামর্শ দিচ্ছে তারা অতি মন্দ লোক। তাদের কথায় নিজের ও আমার সর্বনাশ করো না।'—কিন্তু ভৈরবী মার এত কথা সবই 'অরণ্যে রোদন' হল।

উমাচরণ সরকারের চিত্ত তখন ঘোর তমোতে আচ্ছন্ন। কোন সদুপদেশ তাঁর কানে ঢুকল না, কেবল এইটুকু বুঝলেন হেমলতা আর তাঁর ঘর করবে না। সামনা সামনি বাদানুবাদ করার উপায় ছিল না। সন্ত চোর-দায়ে ধরা পড়ে কেবল ঠাকুরের দয়ার জেল খাটা থেকে রেহাই

পেয়েছেন। 'যোগেন উকিল' কি ছাড়ত নাকি? মান ইজ্জত্‌ তো গেছেই বুড়োবয়সে, হয়তো বা ঘানি টানতে হত। তাই ঠাকুরকে গালাগালি দিতে পারলেন না, স্ত্রীর কথাগুলিরও উত্তর দেওয়া গেল না। কিন্তু তাঁর সমস্ত আক্রোশ পুঞ্জীভূত হল ওই স্ত্রীরই উপরে। দেখা যাক্‌ ওর ভৈরবীগিরি তিনি ঘোচাতে পারেন কিনা। দুর্গাপুরে ঠাকুরের বিপক্ষে দলের সহায়কারী হলেন তসিলদার। মামলায় সাক্ষী না দেওয়ার জন্য যারা শ্রীনিগমানন্দের ক্ষতি সাধনে দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছিল, তারা ঠিক করেছে কোর্টে ঠাকুরের নামে ব্যভিচারের মামলা তুলবে। উমাচরণবাবু হবেন সাক্ষী। আর কিছু না হোক, পুলিশ প্রথমেই তো হেমলতা সরকারকে আশ্রম হতে সরিয়ে নেবে। কেমন করে সন্ন্যাসিনী গুরুসেবা করেন দেখে নেব—এই হল সরকার মশাইএর ভাব।

যোগেন্দ্রনাথও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। উমাচরণবাবুর সঙ্গে মায়ের মনোমালিন্য দূর হল না দেখেই তিনি গোপনে সংবাদ নিতে লাগলেন উমাচরণবাবুর অভিসন্ধি কি? দুর্গাপুর ও কুমিল্লা অঞ্চলে ঠাকুরের যে সব অনুরাগী শিষ্যভক্ত ছিলেন তাঁদের কাছে শত্রুপক্ষের পরিকল্পনা জানা মাত্র যোগেন্দ্রনাথ নিজে গিয়ে ঢাকার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলেন। ভৈরবী মা নাবালিকা বা অল্প-বুদ্ধি সম্পনা কি অপ্রকৃতিস্থা নন। তিনি স্বামীর অনুমতি নিয়ে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বৈষয়িক কারণে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন দুর্গাপুরের একদল লোক শ্রীনিগমানন্দদেবের আশ্রম লুট করিয়েছে এবং তারাই মিথ্যা মামলা তুলে আমাদের গুরুদেবের মানহানির উপক্রম করেছে। কমিশনার সাহেব স্বয়ং মধ্যস্থ হয়ে এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করুন—এই হল উকিল যোগেন্দ্রনাথ সরকারের আবেদন। নিজে সমস্তটা ব্যাপার পুলিশ কমিশনারকে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি তাঁকে ভৈরবী মায়ের এজাহার নিতে বললেন। সাহেব সসম্ভ্রমে বললেন, তিনি হিন্দু সমাজের ভদ্র মহিলা। আমার সামনে আসবেন কি? যোগেন্দ্রনাথ বললেন, তিনি 'হিন্দু সন্ন্যাসিনী' জগতে সব পুরুষই তাঁর

সন্তান। সন্তানের সম্মুখে আসতে এদেশে মায়ের কোন বাধা নাই।' I see, I see! খুসী হয়ে কমিশনার কথা দেন "Well Sircar, I must go to visit her myself." তাঁকে বল, তাঁর কোনও ভয় নাই—আমি নিশ্চয় তাঁকে এ অসম্মান হতে রক্ষা করতে পারব।

ঘোর সংকটের সম্মুখীন হয়ে কুলবতীর লজ্জা সঙ্কোচ পরিহার করে প্রকৃত সন্ন্যাসিনীর মতই অকুণ্ঠিত মহিমায় যোগমায়াদেবী কমিশনারের সামনে বসে তাঁর বক্তব্য সরল ভাষায় বলে গেলেন। দোভাষীর মাধ্যমে জানালেন, তিনি নিঃসন্তান। স্বামীর অনুমতিক্রমে প্রৌঢ় বয়সে শ্রীগুরুর কাছে সন্ন্যাস নিয়ে সাধন-ভজনে নিরতা। এতদিন তাঁর স্বামীও সে পথের সহযাত্রী ছিলেন। আজ অসৎলোকের চক্রান্তে সরলবুদ্ধি সরকার মশাই বিপথগামী। এরকম ক্ষেত্রে ধর্মভ্রষ্ট স্বামীর অন্যায়াচরণের সহায়তা করা কোনও হিন্দু স্ত্রীর কর্ত্তব্য নয়। তিনি আবার সন্ন্যাসিনী তাঁর কর্ত্তব্য পূর্ব্বাশ্রমের পরমাত্মীয়কে সুপথে পরিচালিত করা। আপ্রাণ প্রয়াসেও তা যদি সিদ্ধ না হয়, তখন তার সংশ্রব ত্যাগ করে অধ্যাত্ম পথে অগ্রসর হওয়াই হিন্দু-শাস্ত্রমতে সাধ্বীর একমাত্র কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত 'মীরা এবং করমেতী'—দুজনেই অনাচারী, কদাচারী স্বামীর সংশ্রব ত্যাগ করে সাধিকার জীবনই বরণ করেছিলেন। হিন্দু সমাজ অদ্যাবধি তাঁদের মহীয়সী মহিলা জ্ঞানে পূজা করে।

ভৈরবী মায়ের বক্তব্য শুনে পুলিশ কমিশনার সন্তুষ্ট হলেন। মাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়ে উভয়ের মধ্যস্থ যোগেন্দ্রনাথকে বললেন 'মাকে, বলুন তাঁর কোনও চিন্তা নাই। তাঁর অনিচ্ছায় কেউ তাঁকে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারবেনা বা আদালতে তাঁর গুরুদেবের নামে অভিযোগ আনতে পারবেনা। আমি আজই কর্ত্তৃপক্ষকে বলে ব্যবস্থা করব। পরমহংস নিগমানন্দদেব বা ভৈরবী মায়ের নামে কোনও অভিযোগ যেন আদালতে গৃহীত না হয়, কারণ সে অভিযোগ ভিত্তিহীন মিথ্যা রটনা মাত্র। আর আপনাদের এখানে পুলিশের দৌরাত্ম্য যে হবে না সে আমিই কথা দিচ্ছি।'

ঠাকুর নিগমানন্দদেব আবাল্য সত্যসন্ধ ছিলেন বলেই পরিণামে তিনি

সত্য স্বরূপ 'সদ্‌গুরু' হয়েছিলেন। তাঁর নীতি ছিল শাস্ত্রবাক্য গুরুবাক্য এবং নিজের উপলব্ধি—এ তিনটির সমবায়ে সত্য নির্ণয়। এ জন্য সাধনা ও সিদ্ধির সবগুলি পর্ব অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত তাঁর তপস্যার ক্ষান্তি ছিল না। তান্ত্রিক সাধনার চরম প্রাপ্তি মন্ত্রসিদ্ধি ও ইষ্টদর্শন, জ্ঞান যোগের পরমাসিদ্ধি অপরোক্ষানুভব। তবুও ঠাকুরের সত্যান্বেষণ শেষ হয়নি। জ্ঞানসিদ্ধ পরমহংস হয়েও ভাবাশ্রয় করে তিনি জ্ঞানী ভক্তের মহাফল প্রেম-ভক্তি লাভান্তে "ব্রহ্মদর্শন" করে স্বয়ং 'পরাবর ব্রহ্ম বা পূর্ণপুরুষ' হয়ে গেলেন। 'ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান'—অদ্বয় তত্ত্বের এই ত্রিপুটি একাধারে যিনি সম্যক অবগত আছেন, পারমহংস সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মতে তিনিই 'পরমহংস বা জগদ্‌গুরু'। ঠাকুর নিগমানন্দ গারোহিল যোগাশ্রমে এই লক্ষণাক্রান্ত হয়েই সদ্‌গুরু পদবীতে আরূঢ় হয়েছিলেন। তখনই তিনি অমূর্ত ব্রহ্মের মূর্ত প্রকাশ। অথচ এ তত্ত্ব জানা সত্ত্বেও তাঁর গুরুপিতা সচ্চিদানন্দজী আদেশ না করা পর্য্যন্ত তিনি সাক্ষীভাবে গুরুগিরি করেন নি। হেমলতা মাকে সন্ন্যাস প্রদানের সময়ও তিনি ঠিক সেই রকম অকর্তা। স্বচক্ষে মা-ঠাকুরাণীকে যোগমায়া দেবীর দেহে আবিষ্টা হতে দেখেও তিনি পূর্ব্ববৎ নিশ্চেষ্ট থাকলেন। তদ্‌গতপ্রাণা শিষ্যাকে মহাসমস্যায় বিভ্রান্ত দেখেও নির্ম্মমের মত বললেন 'তোমার এখন উমাচরণের সঙ্গে যাওয়াই ভাল। তা নইলে আমার গুরুদত্ত জগদ্ধিত ব্রতপালনে বিঘ্ন ঘটবে।' কঠোর পরীক্ষা নিলেন তাঁর সন্ন্যাসিনী সেবিকার। 'নিজের পথ নিজেই বেছে নাও' উদাসীনের মত অনুজ্ঞা করে যোগমায়া দেবীর গুরুনিষ্ঠা যাচাই করলেন।

কিন্তু ঠাকুর তাড়িয়ে দিলেও আমি আর সংসারে ফিরে যাব না, পথে পথে বরং ভিক্ষা করে খাব—ভৈরবী মায়ের এই নিশ্চয়াত্মিকা সদ্‌বুদ্ধিতে আবারও প্রমাণ হল তিনি গুরুশক্তি কর্তৃক পরিরক্ষিতা। গুরুকৃপায় সব সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল। বিপদোত্তীর্ণা ভৈরবী মা স্বমহিমায় আবার ঠাকুর মহারাজের সেবাধিকার ফিরে পেলেন।

দুর্গাপুর আশ্রম তুলে দিয়ে ঢাকা গেণ্ডারিয়া অঞ্চলে নতুন আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ১৩১৮ সালের ১৮ই বৈশাখ মহাসমারোহে অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব সম্পন্ন হল। সেদিন কুমিল্লা হতে ঠাকুরের বহুভক্ত এসেছেন—অনেকেই সুগায়ক। তাঁদের মধ্যে যোগানন্দজী নিশিবাবু, অম্বিকা গুহ ইত্যাদির নাম করেছেন। সকাল হতেই কীর্ত্তনানন্দে আশ্রম প্রাঙ্গণ মুখরিত। ঢাকা ময়মনসিংহের ভক্তদের মধ্যে সপরিবারে নৃপেনদা, যোগানন্দ ও স্বরূপানন্দজীর নাম উল্লেখ যোগ্য। বিকালে সদলবলে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস উপস্থিত হওয়ায় আনন্দমত্ততা আরও বাড়ে। সকলেই ভাবাবেশে মাতোয়ারা। প্রত্যেকে না হক, সে সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রধান শিষ্য-ভক্তরা প্রায় প্রত্যেকে ছিলেন সুকণ্ঠ। উদ্দণ্ড কীর্তনে বিভোর হয়ে নৃত্য করছেন ভক্ত-শিষ্যমণ্ডলী—সেই আনন্দোল্লাস বহিরঙ্গন অতিক্রম করে অন্দরমহলের আবহাওযাকেও উত্তাল করে তুলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সদর অন্দরের মাঝামাঝি একখানি ঘরে বসে আপন মনে তামাক খাচ্ছেন ও কীর্তন উপভোগ করছেন। অদূরে সারাদিনের কর্মাবসানে ভৈরবীমা ও শান্তিমা বসে বিশ্রাম করছেন। সন্ধ্যা আসন্ন দেখে কীর্তন ছেড়ে যোগানন্দজী তাড়াতাড়ি একবার ভিতরে আসছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে। প্রণামান্তে আবার কীর্তনে যোগ দেবেন। মৃদঙ্গের জলদমন্দ্র গুরু গর্জনের তালে তালে সবাই নাচ্‌ছে আর গাইছে।

পরিব্রাজক ভিখারি, সাধ মনেতে ভারি।
মধুমাখা মায়ের আমার মুখখানি হেরি॥
বসে মায়ের কোলে 'মা' 'মা' বলে নাচিব যোগধ্যানে
(ওগো আমার মা মাগো)
একবার বিরাজো মা হৃদকমলাসনে।
তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মা নয়নে॥"

যোগানন্দ মহারাজ কেবল ভিতরের ঘরে এসে ঢুকেছেন, এমন সময় হঠাৎ ভৈরবীমা উঠে দাঁড়িয়েই মহানন্দে নৃত্য করতে লাগলেন।

বহিরঙ্গনের গীত-বাদ্যের তালে তালে তিনি নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছেন কীর্তনের দলের দিকে। সে কি অপরূপ দৃশ্য! মাকে নাচতে নাচতে এগিয়ে যেতে দেখেই শান্তিমা তাঁকে ধরে আটকাতে চাইলেন। পারবে কেন? মাতৃভক্ত যোগানন্দজী লিখেছেন "মা দালানের কোঠা হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কেশপাশ আলুলায়িত, দৃষ্টি স্থির, কটিবসন শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল দেখিয়া শান্তিমা তাড়াতাড়ি কাপড় ধরিয়া ঠিক করিয়া দেন। ভৈরবীমা তখন বাহ্যজ্ঞান বিরহিতা। কীর্তনের উদ্দামতার সঙ্গে তাঁহারও নৃত্যাবেগ বাড়িয়া উঠে। বাহিরে সন্তানেরা যতই উর্ধ্বস্বরে ডাকিতেছে 'ওগো আমার মা, মা, মাগো।' মা যেন ততই আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহার আসন টলিয়া উঠিতেছে। উপস্থিত সকলেই নিশ্চিত বুঝিলেন ভৈরবীমা আজ জগজ্জননীর ভাবে আবিষ্টা।"

যোগানন্দজী বর্ণনা করেছেন—"সেই পরম রমণীয় দৃশ্য, নৃত্য ভঙ্গিমার অপূর্ব গাম্ভীর্য যিনি দেখিয়াছিলেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।" তাঁর সামনেই মায়ের নৃত্যচ্ছন্দ ক্রমে রুদ্রলাস্য হয়ে ওঠে। যাত্রাগানে যোগানন্দজী বাগদলের মুখে একটি কালী-বিষয়ক গান শুনেছিলেন; ভৈরবী মায়ের ভাব দেখে এবার সেই গানটি তাঁর স্মরণ হল—

"জয় জয় কালী মায়ের জয়।
ধিয়া ধিয়া নাচে বেটি যমকে দেখায় ভয়।"

যোগানন্দজী লিখেছিলেন "আজ ভৈরবী মায়ের ঠিক সেই কালীমাতার মত 'ধিয়া ধিয়া নৃত্য' দেখিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলাম, মায়ের উর্ধ্বনেত্র স্থির নিশ্চল। ডান পা উপর দিকে তুলিয়া সজোরে ও সশব্দে পাকা সানে ফেলিতেছেন, (পরক্ষণে) আবার বাম চরণখানিও সেই ভাবে ফেলিতেছেন। হাত দুটি অনুপম ভঙ্গিতে প্রসারিত ও দোলায়িত। ঘোমটা ও গায়ের কাপড়ের আর স্থিরতা নাই। মাথার সুদীর্ঘ এলায়িত

কেশ যেন চরণ চুম্বন করিতেছে। তিনি বাহিরের কীর্তনে যোগ দিবার জন্য চলিয়াছেন এরূপ মনে হইল।"

যে ভৈরবীমা অপরিচিত বলে শ্রীশ্রীঠাকুরের নব দীক্ষিত শিষ্য 'সুরেন দা'ব সামনেও আসতে চানান, আজ শান্তিমা তাঁকে কোন মতেই আটকাতে পারছেন না। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী শান্তিমার দৈহিক বল কম ছিল না, পাঞ্জাবী মায়ের মত ছিল দেহের গঠন। তিনি মায়ের ঘোমটা তুলে দেবেন, কি কাপড়ের আঁচল সামলাবেন, অথবা জোর করে ধরে ফেরাবেন কিছু ঠিক করতে পারছেন না। সবলে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে মহাভৈরবী ভীম চরণ ক্ষেপে ধেয়ে চলেছেন কীর্তনাভিমুখে।

তখন আসন ছেড়ে উঠে এলেন ঠাকুর মহারাজ। চকিতে এসে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরলেন এলোকেশী কালিকাকে। যোগানন্দজী বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দর্শন করেন সেই দিব্য লীলা। শান্তিমা যেন মহাদেবীর অষ্টনায়িকার অন্যতমা পদ্মা—তেমনই রূপ, তেমনই মহিমা। তিনি যোগমায়াদেবীর কটি বেষ্টন করে প্রাণপণে ফেরাতে চাইছেন। আর শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং সেই ধূর্জটি মহামাহেশ্বর। যত শক্তিই থাক, দেবীর সাধ্য কি তাঁকে পরাভূত করেন! যূথপতি গজরাজের মত বিশালদেহী শ্রীনিগমানন্দদেব স্বচ্ছন্দে ভৈরবীমাকে আটকিয়ে গতিরুদ্ধ করলেন তাঁর। তাঁর সামান্য আকর্ষণেই যোগমায়াদেবীকে ঘরের দিকে ফিরতে হল। অনায়াসে এক হাতেই মাকে টেনে এনে ঘরে ঢুকিয়ে ঠাকুর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আরও কিছুক্ষণ আপন মনে নৃত্য করে মায়ের ভাবসাম্য হল।

দুর্গাপুর আশ্রমের ঘটনাতে বা দেওয়ান বাড়ির রটনাতে যে সব ভাগ্যবান শিষ্য-ভক্তের ঠাকুর বা ভৈরবীমায়ের উপর একবিন্দু সংশয় আসেনি, যারা পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় পরমহংস নিগমানন্দদেবের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেছিলেন, অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে কুমিল্লার সেই সব শিষ্য—জয়চন্দ্র বিশ্বাস রাধানাথ দে, গোলক দে ইত্যাদিরাই এসেছিলেন। যোগেশ্বর গাঙ্গুলী,

যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন। কীর্ত্তন নর্ত্তনে বহিরঙ্গনে থাকায় তাঁরা কেউই মায়ের ভাবাবস্থা চোখে দেখেননি, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী যোগানন্দজীর বিবরণ শুনে এঁদের কারও মনেই ভৈরবীমায়ের সিদ্ধা পদবী সম্পর্কে আর লেশমাত্র সন্দেহ রইল না। অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের ওই অলৌকিক ঘটনার পরই শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের কাছে যোগমায়াদেবীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন। যোগানন্দজী লিখেছেন, ঠাকুর নির্জ্জনে আমাদের বললেন "দেখ আমি জগদীশ্বরীকে তোমাদের কাছে এনে দিয়েছি। তোমরা ওরই মধ্যে ভগবতীকে দর্শন করছ জেনে ধন্য হও।" অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠাকুর বলেছিলেন—"তুই মায়ের কোল পেয়েছিস্। তোর ভাবনা কি!"

স্বয়ং ঠাকুরমহারাজের মুখে ভৈরবীমায়ের স্বরূপ জেনে ভক্তিবিগলিত চিত্তে যোগানন্দজী একখানা মাতৃসঙ্গীত রচনা করেন। তার শেষ ছত্র দুটি হল—

শিখেছিলি ধন্য মায়া, সাজলি এবার যোগমায়া
(মা তুই) কখন পুরুষ কখন নারী
নিষ্কামে হও শ্যাম-শ্যামা ॥*

ময়মনসিংহ হতে এই গানটি রচনা করে নিজেই সুর দিয়ে সপ্তাহান্তে এক শনিবার ঢাকা আশ্রমে গিয়ে তিনি রাত্রে গানটি মাকে শোনালেন। দৈনন্দিন কর্ম্মাবসানে মা নিজের ঘরে আসনে বসেছেন। সামনে যোগানন্দজী হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানটি গাইতে আরম্ভ করবার একটু পরই যোগমায়া দেবীর ভাবান্তর হল। দেখতে দেখতে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। ঋজু দেহটি স্থির অচঞ্চল, গান শেষ করে যোগানন্দজী ভক্তিনম্র চিত্তে সেই

মহাযোগিনীকে দর্শন করেন। কিছুক্ষণ পরে মায়ের ভাবভঙ্গ হলে তিনি সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম করলেন। মা তাঁর মাথায় হাত রেখে সস্নেহে আশীর্বাদ জানান। বস্তুত শ্রীশ্রীঠাকুরের সমস্ত সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে মাতৃকৃপাধন্য যোগানন্দ মহারাজ চিরদিনই যেমন নিরুদ্বিগ্ন, শান্ত, আনন্দ জীবন যাপন করে সাধন ভজনে মগ্ন থেকে অন্তকালে জীর্ণ পাতার মত দেহটি ছেড়ে গেছেন এমন আর কারও ভাগ্যে ঘটেনি। সত্যই জগজ্জননী তাঁর ভক্তি বিশ্বাসে প্রসন্না হয়েছিলেন। তাই দুঃখ গহন সংসারে ভাগ্যবান যোগানন্দজী নিত্যানন্দ লাভ করেছেন।

অপরপক্ষে, ভৈরবীমায়ের উপর যাঁদের তেমন শ্রদ্ধা ছিলনা আগেই বলেছি শ্রীকামাখ্যাপ্রসন্ন রায় তাঁদের অন্যতম। যোগমায়াদেবীকে কোনমতেই আশ্রম থেকে সরানো গেল না দেখে তিনি একদিন রুষ্ট হয়ে কি ভাবে মাকে অপমান করা যায় তা ঠিক করতে না পেরে, ঢাকা 'আশ্রমের ঠাকুর ঘরে রক্ষিত মায়ের ত্রিশূলটি এনে ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন। কোন মতেই গায়ের জোরে লোহা ভাঙতে না পেরে শেষে কামাখ্যাবাবু দুইহাতে প্রাণপণে চাপ দিয়ে ত্রিশূলটি বেঁকিয়ে উঠানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। শব্দ শুনে কর্মরতা ভৈরবীমা বাহিরে এসে ত্রিশূলের দুরবস্থা দেখে রোষাশ্রুর পূর্ণ নেত্রে তৎক্ষণাৎ ঠাকুরকে গিয়ে ঘটনাটি জানালেন। রাগে অগ্নিশর্মা শ্রীশ্রীঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে আদেশ করলেন 'চণ্ডী! চণ্ডী! কামাখ্যা বেটাকে এখনই ঘাড় ধরে আশ্রম হতে বার করে দে তো।' চণ্ডীচৈতন্য অর্থাৎ চিদানন্দ মহারাজ তেমনই সেবক। পরমভক্ত কামাখ্যাদাদার সঙ্গে যতই সদ্ভাব থাক, ঠাকুর বলামাত্র একপলক ইতস্তত না করে তখনই তিনি কামাখ্যাবাবুকে ঘাড় ধরে ঠেলে আশ্রম হতে বার করে দিয়ে আদেশ পালন করলেন।

কথাগুলি নৃপেনদার অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছিল। আশ্রমে প্রথমাবধি ভৈরবীমা ও শান্তিমাকে ঠাকুরের সেবানিরতা দেখেও তাঁদের

মনে তো শ্রীনিগমানন্দদেবের পরমহংসত্ব বিষয়ে কোন সংশয় জাগেনি। যোগমায়াদেবীকেও সাক্ষাৎ জগদম্বা মনে হয়েছে। কামাখ্যারায়ের তা হয়নি বটে, কিন্তু ঘাড় ধাক্কা খেয়েও ঠাকুরের পিছু ছাড়েন নি তিনি। আমৃত্যু তাঁর ঠাকুর মহারাজের প্রতি অচলা ভক্তি বিশ্বাস ছিল।

ভৈরবী যোগমায়া সত্যই সেই "লীলা নাটক সূত্র ধারণ করী"র প্রতিরূপা। যোগমায়া মাকে না চিনলে ঠাকুরকে ধরাছোঁয়া কঠিন। গীতা মুখে শ্রীভগবান ঠিক এই কথা বলেছেন

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমাযাসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম॥ ৭।২৫

সবার কাছে স্বরূপ প্রকাশ হয় না। যোগমায়া সমাবৃত বলে মূঢ় ব্যক্তিরা আমায় সেই অজর অব্যয় পুরুষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ "ভগবান" বলে জানতে পারে না।

উত্তর আসামের নিভৃত অরণ্যাঞ্চলে দুর্গম শিবসাগর জেলার কোকিলামুখে সারস্বত মঠ স্থাপিত হল ১৩১৯ সালের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং গুরুব্রহ্মের আসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যখন তখন প্রথম দফায় যে সন্ন্যাসী সপ্তক ঠাকুরের কাছ হতে সন্ন্যাস লাভ করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই সেখানে উপস্থিত। যোগানন্দজী প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এর বিবরণ দিয়েছেন—

"প্রাতেই পূজার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর আসিয়া বেদীর দ্বিতীয় স্তরের বামদিকে সিঁদুর মাখা ত্রিশূল (দুর্গাপুর আশ্রম হইতে আনীত) পুতিয়া দিলেন। নিকটেই ঠাকুরের ব্যবহৃত চিমটা ও পিতলের কমণ্ডলু রক্ষা করা হইল। গুরুব্রহ্মের আসন ও ত্রিশূল প্রতিষ্ঠার পর ভৈরবী মা অবশিষ্ট পূজা আরতি শেষ করিলেন—ঠাকুর সে সময় (নিজে) আসনের নিকটেই বসিয়াছিলেন। অদূরে চিদানন্দ, বোধানন্দ, স্বরূপানন্দ প্রেমানন্দ-

দাদা ও আমি, রমাপ্রসন্ন (পূর্বোক্ত কামাখ্যা রায়ের ছোট ভাই) নরেন (ব্রহ্মচারী বরদা পরে নির্বাণানন্দ) সক্ররাম দাদা এবং লামডিং এর রমন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সকলের সম্মুখেই ঠাকুর মহারাজ জগদ্গুরুর আসন প্রতিষ্ঠা করে সেবা পূজার অধিকার দিলেন ভৈরবী যোগমায়া দেবীকে। সুতরাং আসাম মঠে প্রথম হতেই মা যোগমায়া পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা হলেন। সেবক ও সেবিকা সংঘ সম্পূর্ণ তাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী হল। শ্রীশ্রীঠাকুর মঠের আচার, নীতি ও নিয়মাবলী নির্দ্দেশ করে দিলেন। তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায় প্রধানতঃ ভৈরবীমায়ের। আর সেবিকা সংঘ তাঁর কাছ হতেই ঠাকুর সেবার তথা জীব সেবার শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তীকালে যিনিই ভ্রমণ কালে ঠাকুরের সেবক রূপে নির্দিষ্ট হতেন, তাঁকে ভৈরবী মায়ের কাছেই সেবা পদ্ধতি শিখতে হত।" সুরবালা দেবী মঠে এসে ভৈরবী মায়ের ঠাকুর সেবা নিজের চোখে দেখে আমার কাছে যা বলেছিলেন তা লিখছি—"আসামে সে সময় বছরের নয় মাস বর্ষা লেগে থাকত। তেমনই ছিল শীত আর কুয়াশা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেও বলতে গেলে বাংলার অগ্রাণ পৌষের মত শীত। কুয়াশার চোটে সূর্য্যের দেখা মিলত বেলা নয়টায়। বেলা দেড়টা দুটাতেই আবার আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আসত। গ্রীষ্মকালেই এ রকম—বর্ষা ও শীতে সূর্য্যের মুখ দেখতাম না বললেই হয়। কোন দিন সাড়ে এগারটা বারটায় হয়ত একটু রোদ দেখা দিল—তারপরই কুয়াশা আর শীত। বর্ষা চলছে মাসের পর মাস। বর্ষা কমার পরই সন্ধ্যায় শিশির পড়া আরম্ভ হল। রাত্রে টিনের চাল হতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার মত শিশির ঝরত। এই শীত, বর্ষা ও কুয়াশায় চিরদিন দেখেছি মায়ের (ভৈরবী মা) পড়নে একখানি শাড়ি ছাড়া আর কিছু নাই। শীত বেশী পড়লে ছোট একটা চাদর গায়ে দিতেন বিশ্রাম কালে। কাজের সময় তাও না। রাত্রে ঠাকুরভোগ শেষ হতে প্রায়ই এগারটা হত। ঠাকুর ঘুমাবার পর মা প্রসাদ পেয়ে রান্নাঘর ইত্যাদি মেয়েদের দ্বারা ঠিক মত লেপা-মোছা হয়েছে কিনা দেখে ভোগের বাসন ও হাঁড়ি কড়াই বার করে নিতে বলতেন

সেবিকাদের। নিজে যখন শুতে যেতেন তখন রাত্রি প্রায় একটা। কতটুকু ঘুমাতেন কে জানে। শেষ রাত্রি চারটায় সেবকদের ঘণ্টা পড়তো। ছেলেমেয়ে সকলেই উঠে স্নান সেরে যে যার নিত্য কর্ম্মে লেগে যেতেন। মা এবার নিজে স্নান করতে ছুটতেন। সেই সময় নিজের হাতে ঠাকুরের পায়খানা ঝাঁট দিয়ে লেপে মুছে রাখতেন। পরে পাকা পায়খানা হলে নিজেই রোজ সকালে তা জল ঢেলে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে ন্যাতা দিযে মুছে শুকিযে যাওযার ব্যবস্থা করতেন। প্রতি দিন মেজে ঘষে সোনার মত ঝকঝকে করে রাখতেন তাঁর জগ, করঙ্গা, পিকদানী, ঘটি ও গাড়ু। তারপর স্নান সেরে ভিজা কাপড় ছেড়েই আবার গিযে ঢুকতেন ঠাকুর ঘরে।

ঠাকুরের ঘুম ভাঙা মাত্র নিজের হাতে তামাক সেজে জলন্ত টিকা সহ কলিকাটি হুঁকায় বসিয়ে ঠাকুরের হাতে হুঁকার নলটি ধরিয়ে দিয়েই ভৈরবীমা ছুটতেন গাড়ু ও গামছা পায়খানায় রেখে আসতে। শৌচাদির আয়োজন রেখে এসে ঠাকুরের মুখ ধোয়ার জন্য বসার চৌকি, হাত মুখ ধোয়ার জলভরা জগ ঘটি মাজন জিবছোলা আর গামছা যথাস্থানে সাজিযে রাখতেন। তারপর বঁটি নিয়ে বসে যেতেন সকালের ভোগ সাজাতে। তিনি ফল কাটা মিষ্টি বা অন্য কি ভাঁড়ারে আছে দেখাশুনা বা চিড়া মুড়ির উপকরণ সংগ্রহ করতে করতেই তামাক খাওযা সেরে শ্রীশ্রীঠাকুর শৌচাগারে চলে যেতেন। মা অমনই ভাঁড়ার ঘর হতে বেরিযে ঠাকুর ঘরে ঢুকে ক্ষিপ্র গতিতে ঠাকুরের বিছানা ঝাড়া মশারি তোলা সেরে তাকিযা বালিশ ইত্যাদি পিটিয়ে গোলগাল করে পরিপাটি বিছানা সাজিযে খাট টেবিল চেয়ার শুকনা কাপড়ে মুছে ঘর লেপার কাজটিও নিপুন হাতে সেরে ফেলতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শৌচকৃত্যসেরে ফিরতেই গরমকাল হলে তাঁকে একটু বাতাস করে হাতমুখ ধোয়ার সাহায্য করতেন। পাশে থেকে ঘটি করে জল ঢেলে দেওয়া, মুখ ধোওয়া হলে জল ঢেলে হাঁটু পর্য্যন্ত পা ধুইয়ে গামছায় সযত্নে মুছে নেওয়া ইত্যাদি করতেন। তারপর চলত কাছে বসে

সকালের জলখাবার খাওয়ানো। জগহিত ব্রত উদ্‌যাপনে সদাকর্মব্যস্ত গুরুমহারাজকে যে ছোট ছেলের মত, বলে কয়ে জোর করে খাইয়ে দিতে হবে—সে ভৈরবীমায়ের অজানা ছিল না। এমনও হয়েছে যে তিনি ভাঁড়ার ঘরে গেছেন ভোগ আনতে, ঠাকুরের মনে হল—আর্য্যদর্পণের একটা লেখা কাল দেখা হয়নি। তখনি গিয়ে টেবিলে বসে পড়লেন। এসে ব্যাপার দেখে যোগমায়াদেবী গিয়ে ঢুকলেন শয়ন ঘরে—"এ কি? জলখাবার না খেয়েই চলে এলেন? তা হবে না, আগে খেয়ে নিন?" 'আমার সময় নাই এখন' গভীর মনোযোগে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কলম চালাচ্ছেন ঠাকুর। বড় মাও * তো ছাড়বার পাত্র নন—ঠিক আছে, তা হলে আমি খাইয়ে দিই। এই নিন, হাঁ করুন—একটু ফিরুন এদিকে। ঠাকুর মহারাজেরও জানা ছিল যোগমায়ার হাত হতে পরিত্রাণ নাই, বাধ্য ছেলের মত হাঁ করে খাবার মুখে নিয়ে আবার কাজ চলে। কি যে খাচ্ছেন, কাদা না পাথর, না আলুনি অথবা বেজায় ঝাল—কোনও খেয়াল নাই, 'ও ঠাকুর! ভাল হয়েছে মুড়ি মাখা! সন্দেশটা কাল করেছিলাম—মিষ্টি ঠিক হয়েছে?' 'হুঁ'। উত্তর শুনেই বড়মা বোঝেন। কিছুই কানে যায় নি ঠাকুরের। রাগ করে আপন মনেই বলেন 'ভাল লোক যা হোক। যদি বিষ খাইয়ে দিই, তাও চোখ বুজে খেয়ে নেবে। যাক্, আমি প্রসাদ পেয়ে বুঝব কি দোষ ত্রুটি হল।' ঠাকুরের এই অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়েই যোগমায়া দেবী তাঁর শীর্ণ বিগ্রহটি প্রথমে মাংসল পরে বিলক্ষণ স্থূলকায় করে তুলেছিলেন। সুরবালা দেবী বলেছেন, ছোট বাটির এক বাটি ঘরে তৈরী ঘি তিনি প্রায়ই সকাল বেলা ঠাকুরকে খাইয়ে দিতেন। ওই রকম অন্য-মনস্কতার সুযোগেই দিতেন। খেয়াল হলে ঠাকুর কিছুতেই কোনও গুরুপাক ভোজ্য বেশী খেতে চাইতেন না। সাধারণ অন্ন-ব্যঞ্জনের বেলাতেও

* ভৈরবীমা আমাদের সংঘজননী, আসাম মঠে প্রত্যেকে তাঁকে মা বলে' ডাকতেন। আমরা অতঃপর তাঁকে 'বড়মা', বলেই উল্লেখ করব। কারণ তিনি নীলাচল কুটিরের 'বড়মা', সুরবালা দেবীরও 'মা'।

২।১ বারের বেশী কোনও বস্তু খেতেন না। মঠের ফকির দা বলেছেন 'মা গল্প করতেন, বাবা! তোদের ঠাকুরকে খাওয়ানো যে কি দায় সে আমিই কেবল জানি। প্রথম যখন এলেন আমাদের কাছে—খাওয়াতে গিয়ে দেখি সদাই অন্যমনা। কোনও জিনিষ একবারের বেশী মুখে তোলেন না, দু' তিনটা তরকারী করেছি উনি ৩।৪ গ্রাস অন্ন তা দিয়ে মেখে খেয়েই পাত্র ত্যাগ করেন। তখন রোজ পাঁচ পদ রাঁধতাম। একটু পায়স পিঠাও করতাম। দেখি, খাওয়া একটু বেশী হয়—পাঁচ তরকারী দিয়ে পাচ সাত গ্রাস খান, পায়েস খান, একটা পিঠামুখে দেন। আমি তখন দশ ব্যঞ্জন আরম্ভ করলাম। কোন খেয়াল নেই, চেয়েও দেখেন না কি দিয়েছি—তবে সবই একবার দু'বার খেতে হয় বলে খাওয়া দশ-পনের গ্রাস হয়। এই করে করে ওই কটি ভাত ধরিয়েছি। দুধ যা দিই এক চুমুকে খান দেখে বড় বাটিতে ঘন করে জাল দিয়ে একপোয়া দুধ দিই। তবে ওটিতে একটু সাবধান। বাটিটা বড়, চোখে লেগেছে তো। দুধ বাড়ালেও এক পোয়ার বেশী খান না। আমি তাই আধসের দুধ ঘন করে এক পোয়া করে দিই।' বলে খুসী মুখে হাসেন বড়মা। 'কেবল কি আমাদের মা? এ যে দেখি ঠাকুর মহারাজেরও মা।"

যাক্, বড়মায়ের সেবার কথা বলি আবার, জল খাবার খাইয়ে তামাক দিয়ে হাতে নলটি ধরিয়ে দিয়ে তিনি রান্না ঘরের কাজে যেতেন এরপর। মঠে আসার আগে রাত্রে রান্নাঘর লেপামোছা, বাসন মাজা, সকালে তরকারী কোটা এবং রান্নার যোগাড় করা একা তাঁকেই করতে হত। শান্তিমা আসার পর বাইরের কিছু সাহায্য—যেমন রান্নাঘর মোছা, তরকারী কোটা বা ঠাকুরের প্রসাদী বাসন মাজা তিনিই করতেন। মঠে আসার পর সুশীলামা ও শৈলমা আছেন বলে এসব বিষয়ে সাহায্যকারীর অভাব ছিল না। শান্তিমায়ের উপরে ছিল বাইরের পাক ঘরের ভার। বড়মা ঠাকুরের কাছ হতে এসেই তাঁর সহকারিণীদের নিয়ে বসে যেতেন তরকারী

কুটতে। ডাল ভেজানো, বড়ি দেওয়া, ইত্যাদি ব্যাপার থাকলেই তা রাত্রেই বলে রাখতেন শৈল বা সুশীলামাকে। একটা তরকারী কোটা হলেই তাঁর নির্দ্দেশে একজন ডাল-তরকারী ধুয়ে মশলা বেটে রান্নার জায়গায় গুছিয়ে রাখতেন। তরকারী কিছুটা কুটে আর কি কি কুটতে হবে বলে দিয়ে বড়মা গিয়ে আরেকবার কল্‌কি বদলিয়ে তামাক দিয়ে নল ধরিয়ে দিতেন আবার। তারপর চলত দুই উনুন জেলে পরিপাটি ভোগ পাক। ওরই মধ্যে উঠে গিয়ে দেখতেন আবার তামাক চাই কিনা। সময় মত রান্না শেষ করে এসে লেগে যেতেন ঠাকুরের স্নানের আয়োজনে। স্নানের চৌকি রেখে ঘটি গামছা সাজিয়ে মেয়েদের জলের বালতি এনে রাখতে বলতেন। ঠাকুর স্নান সেরে আসতেই আরেক দফা তামাক দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে। সাতটি জটা তৈরী করে দিয়ে তাঁকে একবার প্রণাম করে মা গিয়ে নিজের হাতে পিঁড়ি পেতে, জগ করজায় জল ভরে হাত মোছা রুমাল সাজিয়ে পিকদানী ও হাত ধোয়ার জলপাত্র রেখে পিড়িতে নরম আসনটি পেতে, বসে যেতেন সাজাতে। তাঁর আদেশ মত অন্ন ব্যঞ্জন সবই ভোগের ঘরে এনে ঢাকা দিয়ে রাখতেন। মা জল ভরা বাটি ও ফর্সা পাতলা একটি নেকড়া নিয়ে মস্ত রূপার থালায় চূড়া করে অন্ন সাজাতেন নৈবেদ্যর মত। বার বার থালা মোছা হচ্ছে জল নেকড়া দিয়ে। ভাত পড়ে কোথাও যেমন একটু দাগ না ধরে। সব শেষে আবার একবার হাতের নেকড়া দিয়ে সন্তর্পণে থালাটি মুছে ঝকঝকে করে নিমকদানীতে লেবুর টুকরা লবণ দিয়ে থালা ঘিরে বাটিতে বাটিতে সাজিয়ে দিতেন সাত আট পদ ব্যঞ্জন। নিজে গিয়ে ঠাকুরকে ডেকে এনে ভোগে বসিয়ে চলত যৎপরোনাস্তি বেশী খাওয়ানোর চেষ্টা। 'এটা খান, ওটা খান' দুই তিনবার বলার পরও ঠাকুর বেশী নিচ্ছেন না দেখে নিজেই ছোট হাতা করে পাতে তরকারী ডাল ইচ্ছা মত তুলে দিতেন। কম খেলে তাঁর রীতিমত কষ্ট হয় দেখে ঠাকুরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটু বেশীই খেতে হত।

এমনি করেই অসাধারণ বলবান ও কর্মক্ষম 'রমতা সাধু' শ্রীনিগমানন্দ

শেষে কায়িক শ্রমে অনভ্যস্ত ও অনিচ্ছাতেও সেবাগ্রহণে বাধ্য হয়ে পড়লেন। মলিন চিত্ত যারা, তারা তাঁর যোগীদেহের স্থূলতা ও কর্মে অপটুতা দেখে যতই নিন্দা করুক, জগদীশ্বরী জানতেন তাতে ঠাকুরের কোন হাত ছিল না। ওটি দেবীরই অপকৌশল। শ্রীশ্রীঠাকুর সেবাগ্রহণে বাধ্য না হলে 'যত রাজ্যের 'ওছা'রা তাঁর সান্নিধ্য পাবে কি করে, আর তারা গুরুপদে অপরাধী না হলে, দেবীই তাদের নানা দুঃখ ও নির্যাতন করার সুযোগটি পাবেন কি করে? সাধন ভজন করবে না, কেবল ঠাকুরের ইচ্ছাতেই তিন জন্মে মুক্তি পেয়ে যাবে? মহামায়া কি অত সহজে দরজা খুলে দেন? কাজেই বড়মাকে দিয়ে এমন সেবাই তিনি করলেন যে, কোন মেয়ে দূরে থাক, কোনও ছেলেরও সাধ্য নাই এমন অবিশ্রাম কলের মত খাটবে।

আর কেবল কি খাটুনি! সে কি শুচিশুদ্ধ ঠাকুর সেবা! সুরবালা দেবীর কাছে শুনেছি নিষ্ঠাবান পূজারী যে ভাবে সদাচারে দেবতার পূজা করেন, ঠিক সেই ভাবে মঠের মা ঠাকুরের সেবা করতেন। তাঁর পান খাওয়া অভ্যাস ছিল। কিন্তু যতবার পান খাচ্ছেন, ততবারই ঘটির জলে হাত ধুয়ে মুছে তবে ঠাকুরের জিনিসে হাত দেওয়া। উচ্ছিষ্ট বিচার এত বেশী ছিল যে পানের বোঁটায় চুণ লাগিয়ে সেটা দাঁতে কেটে তৎক্ষণাৎ হাত ধুতে কখনও ভুল হত না। ছুটাছুটি করে কাজ করতে গিযে যদি ঠাকুরের তরকারী বা ফল কাটা বঁটিতে একটু পা লেগে গেল সঙ্গে সঙ্গে তা ধুয়ে ফেলতেন। দৈবাৎ যদি তরকারীর ঝুড়ি বা ফলের চুবড়িতে পা লাগল তো সব ফেলা যাবে। গাছের কোনও ফলে এতটুকু পাখির ঠোকরানো দেখলেই সেটা বরবাদ। সর তুলে ঠাকুর ভোগের ঘি জাল দিতেন মা, ছানা কেটে খাবার তৈরী করতেন নিজের হাতে। মুখ দিলে তো কথাই নাই, বিড়ালে যদি এর কোনটা একবার শুঁকে দেখত, অমনি তা মায়েদের (বালিকা সংঘকে) বা ছোট ছেলেদের দিয়ে দিতেন। সে সব আর ঠাকুর ভোগে লাগবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে বড়মা তো মানুষ দেখতেন না। ঠাকুর তো ঠাকুরই। তেমনি শুদ্ধাচারে সেবা চাই। এর ফলে পরে যাঁরা ঠাকুরের

সেবাধিকার পেয়েছেন, সেই ভুবন, হরিদাস, নীলমণি, জিতেন দাদারা এবং সুরমা (সুরবালাদেবী) ও প্রাচীন সন্ন্যাসীরা সকলেই ঠাকুর সেবায় অতি সদাচারী ও বিচারশীল ছিলেন। এই শিক্ষা ভৈরবীমায়েরই শেখানো। সামান্য একটা কথা বলি, কুটিয়ে ছোটবেলায় সুরবালামাকে ঠাকুরের জন্য কমলালেবু সাজাতে দেখতাম। লেবুর প্রতিটি কোয়ার একটাও স্থতো থাকবে না। তারপর তা দুই ফালি করে কেটে ভেতরের বীচি ফেলে দেওয়া হবে। চার পাঁচটা লেবু এইভাবে পরিপাটি করে কেটে সাজানো কি সহজ কথা? এইসব ছিল ভৈরবীমায়ের সেবা নৈপুণ্য। কমলা খেতে গিয়ে স্থতা মুখে লাগবে, বীচি মুখে পড়বে কেন? খেজুরও অমনি করে ধুয়ে-মুছে বীচি ছাড়িয়ে দিতে দেখেছি। আর ঠাকুরভোগের রুটি? সর্বনাশ, আমি কোনও দিন ওরকম করে কারও জন্য রুটি করতে পারব না বলেই রেখেছি ঠাকুরকে। রুটি হবে ঠাকুর ভোগের মস্ত থালাটির মতন বড় এবং কাগজের মত পাতলা। সেই রুটি একখানি করে তাওয়ায় ভেজে এমন ভাবে আগুনে সেঁকতে হবে যেন পুড়ে না যায় বা দাগ না ধরে। বোঝাই যায় এমন পাতলা রুটি আগুনে ধরলেই পাঁপড ভাজার মত কড়কড়ে হয়ে যায়। স্থতরাং গরম তাওয়ায় জল ঢেলে পাতলা ফর্সা নেকড়া সেই জলে ভিজিয়ে প্রতিটি রুটি ভাল করে সাবধানে মুছতে হবে ২/৩ বার। রুটি যেন ভেঙে না যায়, বেশী জলে নরম কাদা না হয়—এমনই আন্দাজে মুছতে হবে। রুটি এবার নরম হয়ে গেল সাধারণ রুটির মত। প্রতিটি রুটি থালায় ছড়িয়ে তার জল শুকিয়ে স্বাভাবিক হতেই চামচে করে গরম গাওয়া ঘি তুলে আস্তে আস্তে রুটির দুই পিঠে ভাল করে মাখিয়ে দুই ভাঁজ করে অর্ধচন্দ্রাকারে থালায় সাজিয়ে দেওয়া—এই হল রুটি ভোগ। পঞ্চাশ/ষাট বছর আগে দোকান বাজার বেশী ছিল না। অথচ ঘরে ধান-চাল সব গৃহস্থেরই থাকত। তাই চিঁড়াকোটা, ধানভানা, মুড়িভাজা, খৈভাজা, চিড়াভাজা প্রত্যেক মেয়েই প্রায় জানতেন। ঘরেই মুড়িমুড়কি মোয়া লাড়ু তৈরী হত, নানা রকম মিষ্টি খাবার হত। বড় শহর কাছে থাকলে

সাধারণ দরকারে দোকান হতে চিঁড়া মুড়ি বা মিঠাই মণ্ডা কিনলেও গুরু-পুরোহিত সেবা কি দেব সেবায় কখনও দোকানের জিনিস দেওয়া হত না। সকলেই জানতেন ওসব খাবার শুদ্ধাচারে তৈরী হয় না দোকানে। তাই দেব ব্রাহ্মণকে দেওয়া চলে না। সুতরাং মঠের বড়মা যে এসব জানতেন বা ঠাকুরের জন্য এসব করতেন তা এমন আশ্চর্য নয়। কিন্তু ওরকম কটি করা খুব কম মেয়েই জানতেন। এখনও কয়জন জানেন তা বলতে পারব না। মোটকথা সুরবালা দেবী বলেছেন "আমি মায়ের যে সেবা পরিচর্যা দেখেছি এ জীবনে আর কাউকে এমন নিপুণভাবে ঠাকুরসেবা করতে দেখিনি। মায়ের আলস্য বলতে কিছু দেহে ছিল না, খাওয়া, ঘুমের নিয়ম ছিল না। সেকালের মেয়ে বলে স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে জানতেন, তাই দীর্ঘ দিন দেহ কর্মক্ষম ছিল। নতুবা সহজেই কঠিন অসুখ হওযার কথা।"

মঠে গুরু-ব্রহ্মের আসনে মা-ই পূজাদি করতেন। সন্ধ্যায় পূজান্তে জগদ্‌গুরুর আসনে অথবা শ্রীশ্রীঠাকুর এসে আসন বারান্দায় বসলে কখনওবা সাক্ষাৎ সদ্‌গুরুকেই বড়মা আরতি করতেন। সে আরতি দেখে বড়রা দূরে থাক, ছোটরাও মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকত। আরতি করতে করতে বাহ্যজ্ঞান থাকত না ভৈরবীমা'র। কতদিন আরতি করতে করতে ধূপ পুড়ে শেষ হয়ে গেছে, প্রদীপ নিভে গেছে হয়তো। পূজারিণীর খেয়াল নাই আরতি করতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। আত্মবোধ বিরহিতা যোগিনী কায-মনোপ্রাণে আরতি করছেন দেবতার—বাইরের ধূপ শঙ্খ চামর আছে কি নাই তা কে জানে! ১৩২০ সালের ২৯শে শ্রাবণ স্বরূপানন্দজী তাঁর দিনলিপিতে এমনি এক সন্ধ্যার স্মৃতি ধরে রেখেছেন। সেদিন বড়মা আরতি করছেন—অন্তেবাসীরা সবাই আছেন আসন বারান্দায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের অদূরেই ছিলেন স্বরূপানন্দজী। তিনি দেখছেন, পঞ্চপ্রদীপ কাঁপছে মায়ের হাতে। মায়ের কি আরতি করতে কষ্ট হচ্ছে? এমন সময় ঠাকুর বলে উঠলেন "যোগমায়ার হাত কাঁপছে দেখছ তো? ও এখন ভাবস্থা—দেহজ্ঞান নাই।"



আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠাধীশ্বরী মা যোগমায়া

(মঠে সম্মিলনীঅন্তে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)



আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ-কোকিলামুখ

(১৩৪১ বঙ্গাব্দ ।

মঠে বাইরের লোক কমই আসত। অন্তরঙ্গ সেবক সেবিকাদের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ মুখে বলেছিলেন যোগমায়ার বিগ্রহে স্বয়ং মা-ঠাকুরাণীই আবিষ্টা হয়ে তাঁর সেবা সম্পন্ন করছেন। সুতরাং আসাম মঠে সেকালে মা রাজ-রাজেশ্বরীর মহিমায় বিরাজ করতেন। তাঁর ঠাকুর সেবার কথা সবিস্তারে বলেছি। এবার বলি তাঁর শ্রীগুরুতে অটুট বিশ্বাসের কথা।

১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসে ভৈরবীমা সহ শ্রীশ্রীঠাকুর সশিষ্যে তীর্থ ভ্রমণে যান। পুরী গিয়ে সমুদ্রস্নান করব বড়মার এটি বহুদিনের সাধ ছিল। পুরীতে পৌছে ধর্মশালায় ওঠা হল। সেখান হতে জগন্নাথ দর্শন করে পরদিন সকালে ঠাকুর সদলবলে গুণ্ডিচায় চললেন। পঞ্চতীর্থের অন্যতম গুণ্ডিচা পার্শ্বস্থ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে আদেশ করেন "যাও স্নান করে এসে গুণ্ডিচা দর্শন করবে।" বড়মা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন 'আগে সমুদ্র স্নান করব না ঠাকুর'! রহস্যভরে ঠাকুর বললেন 'এই তো সমুদ্র আর সমুদ্র স্নান করবে কোথায়? তাঁর চোখের ইঙ্গিতে সঙ্গীরা কোনও প্রতিবাদ করল না। ওদিকে বড়মার মনে কোনও সংশয় নাই। তিনি তখনই মহানন্দে বেশ করে স্নান করে এলেন। 'কি সমুদ্র স্নানের সখ মিটল?' ঠাকুরের প্রশ্নে খুশীমনে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দেন বড়মা। শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে সকলের সামনেই বললেন 'তুমি কি পুকুর কখনও দেখনি? পুকুর আর সমুদ্র বুঝি এক? আচ্ছা বোকা তো তুমি!' যোগমায়াদেবী নাকি সবিস্ময়ে বলেছিলেন, 'আপনি যে বললেন এইটাই সমুদ্র? তাই ভাবলাম সমুদ্র বোধ হয় বড় পুকুরকেই বলে।' শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন মুখে অন্যান্য সঙ্গীদের বললেন, 'দেখছ ওর কি সরল বিশ্বাস! আমি বলেছি—কাজেই এটা সমুদ্র।' বড়মাকে বুঝিয়ে বললেন, 'খুব বড় পুকুরকে অনেক সময় "সাগরদীঘি" বা "সায়র" বলে, শোননি? তাই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরকে আমি সমুদ্র বা সাগর বলেছি। তা বলে সমুদ্রের সঙ্গে কি সাগরদীঘির তুলনা চলে? আজ বিকালে সমুদ্র দেখাব তোমায়। কাল যত পার সমুদ্র স্নান কর।'

শান্তিমাযের কাছে বডমার এই অচল বিশ্বাসের কথা শ্রীমৎ নির্বাণানন্দজী শুনেছিলেন। আমি আবার তাঁর কাছেই ঘটনাটা শুনেছি।

ঢাকা আশ্রমেই ঠাকুরের আদেশে তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যরা মাকে লাল রেশমী শাডী ফুলের মুকুট মালা ইত্যাদিতে সাজিয়ে পায়ে পুষ্পাঞ্জলী দিযেছিলেন। আসাম মঠে মহাষ্টমীর দিন বড়মাকে বিশেষ করে পুষ্পাঞ্জলী দেওযা হত! ১৩১৯ সালের দুর্গাপূজাতেই অর্থাৎ আসাম মঠ স্থাপিত হওয়ার প্রথম বৎসরই—মহাষ্টমীতে সেবিকারা বড়মাকে বেনারসী শাড়ী পডিয়ে আপাদমস্তক যথাযোগ্য স্বর্ণাভরণে সাজিয়ে পুষ্প ভূষায় সুসজ্জিতা করে ললাটে সিন্দুরবিন্দু ও শ্রীচরণে আলতা পরিযে দিলেন। মায়ের নিজের শাড়ী গহনা প্রায় সবই দুর্গাপুর আশ্রম প্রতিষ্ঠায় ব্যয় হয়েছিল। তারপর আবারও মাতৃভক্ত সন্তানেরা তাঁকে দামী শাড়ী কিনে দিয়েছিলেন। স্বরূপানন্দজীর স্ত্রী সুশীলামা অর্ঘ্য দিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত অলঙ্কার। তারই কিছু ভেঙে নতুন করে বডমাযের জন্য স্বর্ণভূষণ তৈরী করা হয, কিছুবা সুন্দর বলে যেমন ছিল তেমনই বডমাযের জন্য সংরক্ষিত থাকে। বড়মাকে সুসজ্জিত উচ্চাসনে বসিয়ে মহাষ্টমীর দিন সন্ধ্যায় মঠের সব ছেলে-মেযে পুস্পাবৃত্তি করে তাঁর পাযে অবার অঞ্জলী দিলেন। স্বযং ঠাকুর মহারাজ এসে একবার এ অনুষ্ঠান স্মিতমুখে দেখে গেলেন। পূজাকালেই মা সমাধিস্থ হযে গিযেছিলেন। বহুক্ষণ পরে সেদিন তাঁর ভাব ভঙ্গ হয়। এরপর প্রতি বৎসরই শারদীয়া পূজার মহাষ্টমীর দিন মঠে ভৈরবী মাযের পূজা হত।

বড়মায়ের দেবী মহিমার কথা শুনে ও চোখে দেখে সুরবালা মায়ের স্থির বিশ্বাস ছিল ইনি সাক্ষাৎ ভগবতী। ছয় বছরের মেয়ের মনে এমনই দৃঢ় ছিল সে ধারণা যে তিনি একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এখন তো নিত্যলোক খালি আছে, না ঠাকুর ?' তিনি বললেন 'কেন বল দেখি ?' সুরবালা মা বললেন 'এখন আপনি আর মা যে এখানে আছেন! তাহলে সেখানে আর কে থাকবে ? বালিকার ভাব ভঙ্গ না করে ঠাকুর প্রসন্ন হাস্যে

বললেন 'ঠিক বলেছিস ' এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটল যাতে কেবল বালিকা সুধবালাদেবী নন অন্তেবাসী প্রবীণ সন্ন্যাসীরাও বড়মাকে মঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী জ্ঞানে শ্রদ্ধা না করে পারলেন না। সাল তারিখ সঠিক জানা না থাকলেও মঠ প্রতিষ্ঠার ২/৩ বৎসর মধ্যেই এটি ঘটেছিল। ১৩১৯ সালে মহাপূজার পর কালীপূজার প্রাক্কালে বা ৩২০ সালের অনুরূপ সময়েই এটি ঘটা সম্ভব।

ঘটনাটি এই রকম। হঠাৎ একদিন সকালে গৈরিক পরিহিত জন দুই তিন শৈবাবধূত মঠে এসে পরিচয় দিলেন তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ব পরিচিত সতীর্থ। সসম্ভ্রমে তাঁদের আসন দিয়ে সেবক ব্রহ্মচারী এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এই নবাগতদের নাম বলতেই ঠাকুর মহারাজ তখনই উঠে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সদালাপে প্রবৃত্ত হলেন। পরস্পরে কি আলাপ হল তাঁদের, কে জানে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ভিতর বাড়ীতে এসে বড়মায়ের পার্শ্বচারিণী সেবিকাদের সামনেই ঠাকুর মহারাজ গম্ভীর মুখে বললেন, 'যোগমায়া, দু'তিন জন অবধূত এসেছেন, যাঁরা আমার পূর্ব পরিচিত। আজ রাত্রে তাঁরা পঞ্চবটিতে চক্রে বসবেন, তোমাকে তাঁদের সঙ্গে ভৈরবী হয়ে বসতে হবে। কৌলসমাজে প্রথা আছে যে সতীর্থ অবধূত যাচঞা করলে কোনও কৌল তার অবধূত শিষ্যাকে তাদের সাধন-সঙ্গিনী হতে নিষেধ করবে না। কাজেই আমি তাদের প্রস্তাবে সম্মত হতে বাধ্য হয়েছি। ঠাকুরের জলদ-গম্ভীর মূর্তি ও বড়মার স্তব্ধ ভাব দেখে কাজের ছলে সরে গেলেন সেবিকারা। তারপর কি হল তা আর তাঁরা সেদিন জানতে পারলেন না। রাত্রে কাজ কর্ম শেষ করে যে যার নির্দিষ্ট শয্যায় শুয়ে পড়লেন। মঠ সুপ্তিমগ্ন হয়ে গেল।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর শান্তিমা, শৈলমা, সুরমাদের সামনে নিজেই প্রসন্ন স্মিতহাস্যে বললেন—কাল তোমাদের মায়ের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল। মায়েরা ছাড়া আর কেউ এ ঘটনা সে সময় জানতেন না। পরে অবশ্য অন্তেবাসীরাও ঠাকুর মহারাজের কাছে ঘটনার বিবরণ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নিষেধ থাকায় একজনও এ ঘটনা বাইরে রাষ্ট্র

করেন নি। এতকাল পরে সেই ঘটনার একমাত্র জীবিতা শ্রোত্রী সুরবালা মায়ের অনুমতি ক্রমে তা সাধারণ্যে প্রকাশ করছি। কারণ ভৈরবী মায়ের 'দেবী' মহিমার অপরূপ প্রমাণ এটি। যোগমায়াদেবীকে বুঝতে হলে এই ঘটনাও জানা দরকার।

মেয়েরা সরে যেতেই রোরুদ্যমানা ভৈরবী মা সেদিন সকাতরে বলেছিলেন, 'কি করলেন ঠাকুর। অবধূত সমাজে কি বিধি আছে আমি জানি না। নিতান্তই আপনার শরণাগত আমি। চক্রে বসাই বা কি, আর অবধূতীরই বা কি করণীয়, কিছুই আমার জানা নাই। আমি কেবল বুঝি ওরা কয়েকটা অপরিচিত পুরুষ। রাত্রে একা আমায় ওদের সামনে যেতে হবে? এই আপনার আদেশ।' শ্রীশ্রীঠাকুর এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রতি প্রশ্ন করলেন "যোগেশ্বর, যতীন, নৃপেন, রাজচন্দ্র, যোগেন-এরাও তো তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। আমার আদেশে তাদের আদর যত্ন করলে কি করে। প্রয়োজন হলেই অসঙ্কোচে আলাপ কর কেমন করে?' ভৈরবীমা একটু না ভেবে বললেন—'হলই বা অপরিচিত। তারা যে আমার সন্তান- সন্তানের বেলায় সে ছেলে না মেয়ে, মায়ের কি এ ভেদবুদ্ধি থাকে?' ঠাকুর মহারাজ প্রশান্ত মুখে বললেন—'তাই-ই যদি তোমার হৃদগত ভাব হয়, তাহলে এদের কাছেই বা শঙ্কা-কুণ্ঠা কেন? তুমি আত্মশক্তিতে নিজেকে রক্ষা করবে, স্ব-ভাবে অটল থাকবে। আমি তাদের প্রত্যাখ্যান করলে তা বিধি বিরুদ্ধ হবে। সে তো আমি পারব না।'

গুরু সেবাপরায়ণা ভৈরবীমা কিন্তু সেই মুহূর্তেই গুরুকৃপায় 'যা দেবী সর্ব ভূতেষু বুদ্ধি রূপেণ সংস্থিতা' সেই মাহেশ্বরীর আনুকূল্য পেয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যেটুকু উপদেশ দিলেন তার মর্ম্ম বুঝে তৎক্ষণাৎ নিজ কর্তব্য নির্ণয় করে বড়মা ঠাকুরের কাছ হতে ভাল করে জেনে নিলেন চক্রে বসা ব্যাপারটা কি—কি তাঁকে করতে হবে। তারপর মহানিশায় (রাত্রি দ্বিপ্রহরে এক বিশেষ ক্ষণ) প্রাক্‌কালে ললাটে উজ্জল সুবৃহৎ সিঁদুর বিন্দু,

পরিধানে অগ্নিবর্ণ গৈরিক, রুদ্রাক্ষমালিনী ও রুদ্রাক্ষবলয়া হয়ে ভৈরবীমা দক্ষিণ হাতে দীর্ঘ ত্রিশূল সহ আবির্ভূতা হলেন ক্রিয়াকাণ্ডরত শৈবাবধূতদের সামনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জেগেই ছিলেন। যোগমায়া দেবী তাঁকে প্রণাম করে তাঁর অনুমতি নিয়ে যখন পঞ্চবটিতে যাত্রা করলেন, ঠাকুর এসে বসলেন তাঁর শয়ন গৃহের পঞ্চবটী-মুখী বারান্দায়। অন্ধকার রাত্রি, আশ্রম নিস্তব্ধ। কেবল পঞ্চবটীতে ধুনী জ্বলছে, সেই আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে বারান্দা হতে। কিছুক্ষণ পরেই যেমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গিয়েছিলেন, তেমনি ভাবে বড়মা ফিরে আসছেন দেখা গেল। কাছে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে চান 'কি? তুমি চলে এলে যে?' বড়মা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন "ওরা আমায় প্রণাম করে বলল, 'মা, আপনি সন্তানদের ক্ষমা করুন, অপরাধ গ্রহণ করবেন না। আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি।" আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করে ঠাকুর মহারাজ নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করতে গেলেন। বড়মাও গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা দরকার তাঁর।

পরদিন সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা হতেই শৈবাবধূত কয়টি উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধায় বলে উঠল, 'তোমার ভৈরবী সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি স্বরূপা। তিনি সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র আমাদের দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কি "দেবীমহিমা"। বিগ্রহে যেন সাক্ষাৎ "মহামায়ী জগদম্বা" স্বয়ং শূল হাতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখে মনে ভয় হল রীতিমত—ভূতনাথ না হয়ে মহাভৈরবীকে চালনা করে শেষে মায়ের কোপে সাধনায় বিঘ্ন হয় যদি। আমরা আসন ত্যাগ করে সসম্ভ্রমে মাকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালাম। তিনি বসলেন না, মৃদু গম্ভীর স্বরে বললেন, "কি তোমাদের অভিপ্রায় বুঝিয়ে বল আগে। আমি গুরুদেবের আদেশে তোমাদের সামনে এসেছি। তা না হলে আলাপ করা দূরে থাক, বহিরাগত কেউ

কখনও আমার দেখা পায় না।' আমরা তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে যুক্ত করে বললাম, 'মা বহু ভাগ্যে আপনার দর্শন পেলাম তা হলে। বুঝতে পারছি আসনগ্রহণ করে আমাদের সঙ্গে সদালাপে আপনার সম্মতি নাই। আমরা আপনার আশীর্ব্বাদ প্রার্থী; আর কোন অভিপ্রায় নাই। কৃপা করে আমাদের উপর রুষ্টা বা অপ্রসন্না হবেন না।' এই বলে আবার প্রণাম করতেই তিনি প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন 'আশীর্ব্বাদ করি গুরু কৃপায় তোমাদের সাধন বিঘ্ন দূর হ'ক। তাহলে আমি এবার যাই?' আমরা শশব্যস্তে বললাম 'আসুন মা, সন্তানদের ভুলবেন না। কৃপাদৃষ্টি রাখবেন'—বলে আরও একবার প্রণাম করতেই তিনি তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করলেন। তুমি সাধনায় পরমহংসত্ব লাভ করেছ, পরিচিত সন্তান সমাজে একথা শুনেই আমরা তোমার সন্ধানে বার হয়েছিলাম। তোমার ভৈরবীকে পরীক্ষা করে তোমারই পরীক্ষা নিতে চেয়েছি, এখন স্বীকার করছি তোমার কাছে। তুমি পরমহংস সতীর্থ হলেও তোমাকে পরখ করতে গেলে যদি রুদ্ররোষে পড়ি। তাই ভাবলাম ওঁর যিনি ভৈরবী, তাঁকে একবার দেখি। হাজার হ'ক তিনি মাতৃশক্তি ক্ষমা চাইলেই মা প্রসন্না হবেন। শৈব হয়ে শিবকল্প নিগমানন্দদেবকে চালনা করলে অধ্যাত্মমার্গই হয়তো রুদ্ধ হয়ে যাবে এ ভয় ষোল আনা। যাই হোক তুমি আমাদের ধৃষ্টতা মার্জনা কর। সতীর্থদের চাপল্য ভুলে যাও। জীবনে অনেক ভৈরবী চক্রে বসেছি, কিন্তু এমন সাক্ষাৎ 'ভবানী স্বরূপা' ভৈরবী তো আর দর্শন করিনি ভাই। মহাদেবী সত্যই তোমার প্রতি সুদক্ষিণা। সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ! তোমার প্রসাদে আমরা কাল দেবী দর্শন করে ধন্য হলাম। কোটি নমস্কার তোমাকে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর সব কথা পরিষ্কার ভাবে না বললেও আমরা অনুমান করি সতীর্থ অবধূতরা কি জন্য, মঠে এসে ভৈরবী চক্র করতে চাইছেন ঠাকুর তা নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন। এ জন্য তাঁদের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নি। সন্ন্যাসী সমাজে এ শ্রেণীর পরীক্ষা-প্রথা ছিল বলেই ভারতের চতুর্থাশ্রমী সমাজের শীর্ষ স্থানীয় বলে মান পেতেন। সন্তমণ্ডলী নিজেরাই

নিজেদের আশ্রমকে পবিত্র রাখতেন। অনধিকারীর সেখানে মর্যাদা ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সব পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছেন বলেই একদা লিখেছিলেন, 'ভারতের সদ্‌গুরু মাত্রেই আমাকে চিনিবে।' পরীক্ষিত-বীর্য পরমহংস নিগমানন্দ তাঁর সমকালীন সন্ত-মহাপুরুষদের কাছে 'সিদ্ধ-শিরোমণিরূপে' গণ্য ছিলেন। তাঁকে আমরা চিনি নি। আজও চিনি না।

.৩১৪ সাল হতে ২১ সাল সুদীর্ঘ আট বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুর অহোরাত্র মা-ঠাকুরাণীকে যোগমায়াদেবীর দেহে প্রকটিতা দেখতেন। অন্তেবাসীদের মধ্যে স্বামী স্বরূপানন্দ, যোগানন্দ এবং নির্বাণানন্দ তিনজনই বলেছেন, মা যখন প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিজের হাতে প্রসাদ প্রার্থী ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীদের প্রসাদ বিতরণ করতেন, তখন তাঁর মুখে চোখে যে কি এক দিব্য করুণা ও মহিমা ফুটে উঠত যে না দেখেছে সে বুঝবে না। বড়মার গুরু নিষ্ঠায় ও গুরু সেবায় সকলেই অভিভূত হয়ে যেতেন, সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু সূর্য্যেও যেমন কলঙ্ক আছে, তেমনি এই তেজস্বিনী ভৈরবীমায়েরও একটি মাত্র ত্রুটি ছিল! তিনি কায়মনোবাক্যে ঠাকুর সেবা কাকে বলে তা বুঝতেন। কিন্তু জীব ও জগৎ সেবার মহিমা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নাই। ঠাকুর আর ঠাকুরের পরিকরবৃন্দ যে তাঁর দৃষ্টিতে এক হওয়ার কথা—সেবক সেবিকা নির্বিশেষে ছোট বড় সকলের প্রতিই যে তাঁর করুণাদৃষ্টি অপক্ষপাতে বর্ষিত হওয়া উচিত, এই মহাসত্য বড়মার অধিগত হয় নি। তাঁর মতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য এবং তার পরে স্থান পাবে সেই সব গৃহী-সন্ন্যাসী শিষ্য, যারা তাঁর বিচারে ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত। অন্য সকলকে তিনি প্রায় উপেক্ষাই করতেন। অথচ ঠাকুরের মতে, যারা অধম তারাই নাকি শ্রীগুরুর অধিক প্রিয়। গুরুকৃপায় পক্ষপাত নাই। সৌর-কিরণের মত, বর্ষাধারার মত তা ক্ষুদ্র তৃণ হতে মহীরুহ সকলকেই নিরন্তর অভিসিঞ্চিত করে। গুরু নিগমানন্দের এই পরমধর্ম গুরুকৃপাধন্যা ভৈরবীমায়ের চিত্তে যে প্রতিফলিত হ'ল না, তাকেও আমরা ইচ্ছাময়ী জগদীশ্বরীর ইচ্ছা বলেই ভাবি। এই ত্রুটির ছিদ্র অবলম্বনে মাহেশ্বরী আটবৎসর পরে বড়মার

দেহাশ্রয়ে প্রকটিতা হওয়ার লীলা সংবরণ করলেন। সে ঘটনা প্রকাশ করার আগে বড়মার গুরু নির্ভরতার প্রমাণ স্বরূপ আরেকটি সুন্দর ঘটনা বলে নিই।

১১ বৈশাখ ১৩২০ সাল বিকাল বেলায় 'ওনা খালে' (অরুনা খাল ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা মঠের পশ্চিম প্রান্তে প্রবাহিতা ছিল) ঠাকুর মহারাজ সদলবলে নৌকা বিহারে বার হয়েছেন। ভৈরবীমা, শান্তিমা, শৈলমা ও বালিকা সুরবালামা ছাড়াও যোগানন্দজী ব্রহ্মচারী রমাপ্রসন্ন, বালক নরসিংহ ও চিদানন্দ মহারাজ রয়েছেন। খোল করতাল বাজাচ্ছেন বড়রা, উদাত্ত কণ্ঠে যোগানন্দজী হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইছেন—

"হরিনামের তরী বেয়ে যায়, তোরা আয় কে যাবি।
ভব পার হবি তো আয় ত্বরায়॥"

মাঝখানে সুখাসীন মঠাধিপতি তামাক খাচ্ছেন। তাঁর আদেশে তাঁরই সামনে হাত তুলে নাচছেন নরসিংহ ব্রহ্মচারী ও সুরবালামা—শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমের সবচেয়ে ছোট্ট দুই সদস্য-সদস্যা। অন্যরা মধুর কণ্ঠে দোহার ধরেছেন—"তোরা আয় কে যাবি, ভব পার হবি তো আয় ত্বরায়।" খুব জমেছে কীর্ত্তন। বহুদূর নৌকা বেয়ে গিয়ে এবার মঠের দিকে ফিরছে নৌকা। সন্ধ্যা আসন্ন। বৈশাখ মাস হলেও ছায়াঘন হয়ে এসেছে অরুণার দুই তীরেব গাছপালা। শীত করছে জলো হাওয়ায়। যোগানন্দজী যে গানটি ধরেছিলেন, বেশ বড় গান সেটি। ২।৩ বার ফিরে গানটি গাওয়া হয়েছে, তবুও যেন কারো থামতে ইচ্ছা নাই। এখন যে ছত্র দুটি ধরেছেন সকলে—

"আছেন সাধু সঙ্গ দাঁড়ি শ্রীগুরু পারের কাণ্ডারী
ভয় কিরে ভাই দাওরে পাড়ি—
গুরু কাণ্ডারী কর সহায়॥
হরি নামের তরী বেয়ে যায়—তোরা আয় কে যাবি—"

চোখ বুজে শুনছেন ঠাকুর। প্রাণ খুলে নেচে চলেছে ছেলে মেয়ে দুটি।

রমাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী আর প্রেমানন্দজী খোল করতাল নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন উৎসাহ ভরে। নৌকা তখন ভেসে চলেছে। আর বৈঠা টানার তত দরকার নাই—অদূরে মঠ দেখা যাচ্ছে। এমন সময় 'ভয় কি রে ভাই দাও রে পাড়ি' পদটা শেষ হতে না হতে নৌকা হঠাৎ এক দিকে কাৎ হয়ে গেল। তারপরই 'যা: গেল গেল' রবের মধ্যে একেবারে নৌকা উল্টিয়ে সবাই খালের জলে ভাসতে লাগলেন। ছোট ছেলে মেয়ে দুটি ছাড়া সকলেই ভাল সাঁতার জানেন। ঠাকুর মহারাজ প্রথমেই ছোট্ট নরসিংহ আর সুরকে ধরেছেন। তারপর খোঁজ করলেন 'যোগমায়া কই ?' সে সাঁতার জানে না। চিদানন্দ মহারাজ ওদিকে সাঁতরিয়ে তীরে গিয়ে স্বরূপানন্দজী আর সারদানন্দজীকে ডাকছেন, 'নৌকা ডুবি হয়েছে। শীঘ্র একটা কলসী আর লণ্ঠন আন একটা।" একে আসামের ঠাণ্ডা, তায় রাত্রি হয়ে গেছে। বড়মা যে সাঁতার জানেন না চিদানন্দ মহারাজেরা সবাই তা জানেন। চিদানন্দজী তাই আলো ও কলসীর ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। যোগানন্দ, ব্রহ্মচারী রমাপ্রসন্ন ও শান্তিমা ব্যস্ত হয়ে জলে ডুবে ডুবে হারমোনিয়াম, খোল, করতাল, হুঁকা ইত্যাদি তুলে আনছেন। প্রেমানন্দজী ধরেছেন নৌকা। ঠাকুর নাম ধরে ধরে প্রত্যেকের খোঁজ নিয়েছেন। সবাই সাড়া দেন 'এই যে ঠাকুর আমি এখানে।' কিন্তু বড়মার সাড়া নাই তো! ছেলে মেয়ে দুটিকে চিদানন্দজী টেনে নিলেন তীরে। ঠাকুর সাঁতরিয়ে চললেন যোগমায়ার খোঁজে। দেখা গেল হাবুডুবু খেয়ে নির্বিকার মুখে স্রোতে ভেসে চলেছেন তিনি। ডুবছেন, ভাসছেন জল খেয়ে, তাই ঠাকুর ডাকলেও সাড়া দেওয়ার শক্তি হয়নি। ঠাকুর তাঁকে ধরে ফেলে তীরে টেনে এনে প্রশ্ন করেন 'জলে পড়ে আমাদের কাউকে চিৎকার করে ডাকবে তো ? চুপচাপ হাবুডবু খাচ্ছ ?' বড়মা নিশ্চিন্ত মুখে বললেন 'আমার কোনও ভাবনা হয়নি। চেঁচামেচি করব কেন ? ওরা এতজন রয়েছে, সবার উপর আপনি আছেন। জলে ডুবে মরলেই হল ? অত ভয় আমার নাই। ঠিক জানি এক সময় টেনে তুলবেন।'

এতখানি ধৈর্য্য বিশ্বাস আমার অন্ততঃ কোন কালে হবে বলে মনেহয় না।

ভৈরবীমায়ের আরেকটি অলৌকিক মহিমার কথাও শুনেছি। কোকিলামুখ মঠে প্রথমদিকে উৎসব পর্বাদিতে শ্রীশ্রীঠাকুর ঠিক বালকের মত উল্লাস চঞ্চল চিত্তে যা খুশী তাই করতেন। প্রাচীন অন্তেবাসীদের লেখায় এর অনেক প্রমাণ আছে তাঁর হাসি-কান্না, রাগ-দুঃখ বা আশ্চর্য সব খেয়ালের কোনও কারণ কেউ খুঁজে পেতেন না, কি কারণে কে জানে, একদিন হঠাৎ বড়মার উপর শ্রীশ্রীঠাকুর রেগে গেলেন। 'দাঁড়া আজ তোকে মেরেই ফেলব, বলে ভৈরবী মায়ের ঘরে খাটের উপর যে বড় লেপ ছিল তাই নিয়ে মেঝেয় বসা ভৈরবীমাকে চাপা দিয়ে দিলেন ঠাকুর। মায়ের ঘাড় ধরে শুইয়ে তাঁর মাথাটা ঠেকিয়ে দিলেন মাটিতে। তারপর লেপের উপর আরও খান দুই কম্বল চাপিয়ে ভূলুণ্ঠিতা ভৈরবীমাকে ঢাকা হল। তাতেও হল না, বড় দুটা বালিশ পিটের উপর পাশাপাশি রেখে খাটের তোষক টেনে আনলেন সেটা দুই ভাঁজ করে বালিশের উপর ফেলে একখানা বড় পিঁড়ি চাপালেন তার উপরে। যোগমায়াদেবীর সাড়াশব্দ নাই, উপুড় হয়ে মাথা গুঁজে সেই যে পড়ে আছেন, পড়েই আছেন। ব্যাপার দেখে সুরবালামা বিমলা মা, ব্রহ্মচারী নরসিংহ, ঈশ্বর—বালক বালিকারা সব আড়ালে কাঁদতে আরম্ভ করেছে, 'যাঃ মা বুঝি সত্যি মরে গেছেন কি হবে?' খবর পেয়ে দু'একজন প্রবীণরাও উঁকি দিয়েছেন। এ কি? ঘরের মেঝেয় একটা বিছানার স্তূপ তার উপর একখানা পিঁড়ি। সেই পিঁড়ির উপর গম্ভীর মুখে আসন করে বসেছেন ঠাকুর মহারাজ। শান্তিমা বা সুশীলামায়েরা কেউ একজন, কাণ্ড দেখে বাইরে অন্তেবাসীদের ডাকতে গিয়েছিলেন। সবাই আতঙ্কে জড় সড়—যত দুঃখ হচ্ছে মায়ের অবস্থা দেখে ঠাকুরের রুষ্ট গম্ভীর মুখভাবে ততই হচ্ছে ভয়। একটা কথা বলতেও সাহস হচ্ছে না কারও—যদি খ্যাপা আরও খেপে যায় তাতে?—প্রতিকার করাও যায় না, এমনি অসহনীয় অবস্থা একটা। ভৈরবীমা একেবারে নিস্পন্দ, একটা উঃ আঃ শব্দ নাই, তাঁর নড়া চড়া নাই। লেপ কম্বল বালিশ তোষকের উপর বিরাট কলেবর শ্রীশ্রীঠাকুরও পিঁড়ি পেতে জাঁকিয়ে বসে আছেন, নামবার লক্ষণ

দেখা যায় না। এই মহাভারের চাপে সেই প্রবীণা সেবিকার মূর্চ্ছা হল, না প্রাণ গেল, ভ্রুক্ষেপমাত্র নাই তাতে। আশ্রমসুদ্ধ লোকের ওদিকে সব কাজকর্ম মাথায় উঠেছে। অসহায় কাতর ভাবে এ ওর মুখের দিকে চাইছেন। ছোটরা কেঁদে আকুল কিন্তু দূরে গিয়ে কাঁদছে তারা। ঠাকুর যদি শোনেন, কি হবে কে জানে।

প্রায় আধঘণ্টা কি পৌনে এক ঘণ্টা সবাইকে এইরকম আড়ষ্ট করে রেখে বোধ হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাগ কমে এল—ভৈরবীমায়ের পিঠ হতে নেমে খড়ম পায়ে গলিয়ে খটাখট আওয়াজ তুলে নির্বিকার মুখে গুরু মহারাজ নিজের ঘরে চলে গেলেন। অনুগত সেবক চিদানন্দজী তাড়াতাড়ি তামাক সাজতে ছুটেছেন ঠাকুরকে উঠতে দেখামাত্র। বাকী সবাই ঠাকুর অন্য ঘরে চলে যেতেই এক সঙ্গে ছুটে এল মায়ের কাছে। পলকের মধ্যে তাড়িতাড়ি সবাই মিলে হাত-লাগিয়ে পিঁড়ি, তোষক, বালিশ, কাঁথা, কম্বল, লেপ সরিয়ে ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকেন 'মা, মাগো মা!' হাসি মুখে মাথা তুলে উঠে বসেন ভৈরবী মা। সকলের মলিন কাতর মুখভাব দেখে সস্নেহে বলেন 'তোরা বুঝি ভয় পেয়েছিলি ঠাকুরের কাণ্ড দেখে? কি যন্ত্রণা…ও বিমু! ওরে নরসিংহ, ঈশ্বর, কোথায় গেলি সব…আয় না। আমার কিছু হয়নি রে। কেন এত ভয় পেলি সবাই? এ সব ঠাকুরের খেলা বাবা। এতেই ভয় পেলে তাকে নিয়ে ঘর করবি কি করে? দেখ দেখি, কত কাজ পড়ে আছে চারিদিকে? পাগলের খেয়ালে দু'ঘণ্টা সময় শুধু শুধু নষ্ট হয়ে গেল। সেবকদের নিত্য কর্মে পাঠিয়ে, কিছুই যে হয়নি তার নিশ্চিত প্রমাণ দিয়ে ভৈরবীমা সেবিকাদের নিয়ে নিজের কাজে লেগে যান। অন্তেবাসীরা মনে মনে ভাবেন, হতে পারে খেলা। কিন্তু মহাশক্তিময়ী না হলে ওরকম খেলা বরদাস্ত করা বড় কঠিন। আমাদের যেন অমন খেলা বেশী দেখতে না হয় বাপু! এই এক ঘণ্টাতে মাথা ধরে উঠেছে, স্নায়ু যেন অবশ হয়ে গেছে ভয় আর দুর্ভাবনায়। কাজ করতে হাত পা উঠছে না। মনে হচ্ছে ঘরে শুয়ে থাকি চুপচাপ। কি ভয়ানক দৃশ্য!

রোষের অত্যাচারের মত স্নেহের অত্যাচারও যোগমায়াদেবী কম সইতেন না। প্রেমানন্দজীর কথামৃততে এমনি একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সেদিন নন্দোৎসব। সেবিকাদের নিয়ে ভৈরবীমা তালের বড়া ভাজছেন রান্নাঘরে। ঠাকুর সেবকদের নিয়ে পূবের পুকুরে স্নানে মেতেছেন। তালের বড়ার গন্ধে মঠ প্রাঙ্গন ভরে উঠেছে। কে একজন কথাটা বলতেই ঠাকুর ঘাটে উঠে বললেন 'যা, আমার নাম করে এক চুবড়ি বড়া চেয়ে নিয়ে আয়। বড়া আনতেই ঠাকুর সেই বড়া মুঠা মুঠা করে পুকুরে ছুঁড়ে ফেললেন আর ছেলেদের বললেন 'ধর ধর,—কে কয়টা ধরতে পারিস দেখব।' আরেক চুবড়ি বড়ার ফরমাস গেল রান্নাঘরে। কাড়াকাড়ি করে পুকুরে বড়া ধরা চলেছে—আবার ঠাকুর মুঠা ভরে বড়া ছুড়ে ফেলেন জলে। ভিজে বড়া খেতে খেতে অন্তেবাসীরা তীরে উঠতেই তৃতীয় এক চুবড়ি গরম বড়া আনিযে এবার নিজে সেগুলি ওদের হাতে ঠাকুর বিতরণ করলেন। তালের বড়া কত কষ্টে করতে হয় তা মায়েরা নিশ্চয় জানেন। সেই বড়ার এ অপব্যয ভৈরবীমা হাসি মুখেই সয়েছিলেন। নাহলে নিশ্চয় আবার, পূর্ব্বের ন্যায় লেপ চাপা খাট চাপা দেওয়া হত।

এই ভৈরবীমাকে মাহেশ্বরী একদা ছেড়ে গেলেন। ১৩২১ সালের একটা সন্ধ্যা বেলা। সন্ধ্যার জলযোগান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তাঁর শয়ন মন্দিরে বসে আছেন। অন্য সকলেই যে যার নির্দিষ্ট কর্মে ব্যাপৃত। এমন সময় হঠাৎ ঠাকুর দেখলেন পূর্বদিকের গোলাপ বাগানে আমাদের মা-ঠাকুরাণী জ্যোতির্ম্ময়ী বিগ্রহে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। চমকে উঠলেন ঠাকুর মহারাজ। একি আজ এভাবে দেখছি কেন? যোগমায়া দেবীর সন্ন্যাস লাভের পর হতে তাঁর আধারেই মাকে প্রকটিতা দেখতেন তিনি, এমন পৃথক বিগ্রহে আবির্ভূতা হয়েছেন, কি জন্য? শ্রীগুরুর অনুক্ত প্রশ্ন বুঝে চিন্ময়ী মাহেশ্বরী মধুরকণ্ঠে বললেন, 'আজ হতে আমি যোগমায়াকে ছেড়ে গেলাম। আর ওকে আমার শক্তিতে আচ্ছন্ন করে রাখব না। তাতে ওর অধ্যাত্ম প্রগতি ব্যাহত হচ্ছে, নিজেকে জানা হচ্ছে না।'

ভৈরবীমা তখন তাঁর ঘরে বসে ঠাকুরের রাত্রি ভোগের আয়োজন করছেন। আশেপাশে অন্য সেবিকারা তাঁর নির্দেশমত কাজে ব্যস্ত। সুরবালামা কোনও একটা প্রয়োজনে বাইরে যাচ্ছেন—এমন সময় দেখেন গোলাপ বাগানের মাঝখানে যে রাস্তা—সেই পথ ধরে ঠাকুর তাঁর ঘর ছেড়ে যেন একটু দ্রুত পায়ে ভিতর বাড়ীতে আসছেন। এমন সময় তিনি আপন মনে তাঁর শয়নমন্দিরে থাকেন—এদিকে তো আসার কথা নয়। তাছাড়া তাঁর চলার ভঙ্গিও যেন স্বাভাবিক নয়। ঠাকুরের এই ভাবস্খলিত টলমল গতি অন্তেবাসীরা ভাল করেই চিনতেন। অর্দ্ধবাহ্য দশাতেই শ্রীশ্রীঠাকুর এরকম মদমত্ত ভাবে কখন দ্রুত, কখনও ধীরে চলেন। চলতে গিয়ে যেন পা ঠিকমত পড়ছে না এমনই মনে হয়। সুরবালামা এসব ভাবতে ভাবতেই ঠাকুর তাঁর পাশ কাটিয়ে বড় মায়ের ঘরে ঢুকে পড়লেন। সুরবালামাও সন্তর্পণে পিছনে এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ান। ঘরে ঢুকতেই ঠাকুর মহারাজ ভাঙ্গা গলায় বলে উঠলেন, 'জগা, তুই এখনও আছিস ? এই 'জগা' ডাকটিও ভাবস্থ দশারই ডাক, সহজাবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়মাকে 'যোগমায়া' বলে ডাকতেন। কিন্তু ভাবের ঘোরে 'জগা' বলতেন। ওটি যোগমায়ার অপভ্রংশও হতে পারে। অথবা যোগমায়া তখন জগন্ময়ী। তারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে 'জগা'। যোগানন্দ মহারাজ আর যোগমায়া দেবী—ভাবস্থ ঠাকুরের মুখে দুজনেই হতেন 'জগা'। কারণ নারী পুরুষে ভেদবুদ্ধি নাই তখন, উভয়েই জগন্ময়ীর অংশবিশেষ। ঠাকুরের ওই অতর্কিত ব্যাকুল আহ্বানে সবিস্ময়ে বড়মা মুখ তুলে চাইলেন, 'যাব আবার কোথায় ? এখানেই তো আছি ঠাকুর ! কি বলছেন।' ভাব দেখে আর ভাঙ্গা গলার ডাক শুনে বড়মাও বুঝেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর সহজাবস্থায় নাই। তাঁর কাছে বসে পড়ে ঠাকুর রুদ্ধস্বরে বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম তুই বুঝি আর নাই, মরে গেছিস।' বলতে বলতে বড়মার পিঠে মাথা রেখে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেললেন ঠাকুর। হাতের কাজ ফেলে রেখে ছোট ছেলেকে ভোলানোর মতই তাঁর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঠাকুরকে সান্ত্বনা দেন বড়মা, 'আমার মরা কি

আমার হাতে নাকি ঠাকুর। আপনি জানবেন না, আমি মরে যাব, একি হয় নাকি কখনোও?' সেবিকারা নিঃশব্দে যে যার কাজ করে চলেন। খানিকক্ষণ কেঁদে গুরুমহারাজ নিজেই আবার প্রকৃতিস্থ হয়ে ধুতির খুটে (আঁচলে) চোখমুখ মুছে বললেন, 'কি জানি, আমার হঠাৎ কেমন মনে হল তুমি বোধহয় আর নাই। আমাকে ছেড়ে গেছ।' শ্রীশ্রীঠাকুরের এই অকারণ শঙ্কায় আনন্দে প্রাণ ভরে ওঠে বড়মার। আহা তাঁর ঠাকুর, কত ভালবাসেন তাঁকে। ঠাকুরের এই অহেতুক শঙ্কায় তো তাঁর গভীর স্নেহেরই পরিচয় মেলে।

অন্য কেউই কিন্তু বোঝেনি ঠাকুরের এই আকস্মিক অহেতুক ভয় ও রোদনের মূলে কি ব্যাপার আছে। বহুদিন পরে সুরবালা মা তাঁর কাছ হতে প্রকৃত তথ্য জেনেছিলেন। "আমি এবার ওকে ছেড়ে গেলাম" মহাদেবীর এই কথায় প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশঙ্কা হয়েছিল, দেবী বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ত যোগমায়া দেবীর মত গুরুসেবা পরায়ণা শিষ্যার দেহপাত হবে। তাই তিনি ছুটে এসেছিলেন ভৈরবীমায়ের সন্ধানে। তার পর যখন দেখলেন, না—তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহ ঠিকই আছে, তখন অপ্রাকৃত বেদনায় প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল ঠাকুরের। দীর্ঘ আট বছর যোগমায়াকে তিনি মানবী দেখেন নি। সর্বদাই মা-ঠাকুরাণীর বিগ্রহ দর্শন হত স্থূল আধারে। সে দিন সন্ধ্যায় যখন আর মাহেশ্বরীর অনবদ্য অনিন্দ্য সুন্দর রূপ স্থূলে দর্শন হল না, দেখলেন তার পরিবর্তে প্রৌঢ়া ভৈরবীমা তাঁর সেবায়োজনে ব্যাপৃতা শ্রীশ্রীঠাকুর অতর্কিতে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। হায়! এতদিন অহোরাত্র যাঁর সান্নিধ্য পেয়ে আনন্দসাগরে ভাসতেন তিনি, এবার সে আবার চিন্ময় আবরণে আড়াল হয়ে গেল। সহজ ভাবে এই জগতে আর সে সদা-সন্নিহিতা হবেনা জেনে বিচ্ছেদ ব্যথায় অভিভূত হলেন ঠাকুর মহারাজ। আত্মস্বরূপে অটল প্রতিষ্ঠ গুরু মহারাজের অচল গাম্ভীর্য কিছুক্ষণের জন্য লুপ্ত হল। চোখের জলে বুক ভেসে গেল অনিচ্ছাতেও। হায় রে, সাধনার পরমাসিদ্ধি এতদিনে

আবার তাঁর করতলচ্যুত হল। অষ্টপ্রহর আর সেই মনোময়ী মূর্তি মর্ত্যধামে দৃষ্টিগোচর হবে না।

ভৈরবী মায়ের দেহাশ্রয়ে পরমেশ্বরী যে ঠাকুরের সেবারতা আছেন—অন্তরঙ্গ গৃহী-সন্ন্যাসী শিষ্যরা একথা ঠাকুরের কাছেই শুনেছিলেন। কিন্তু মহাদেবী যে তিরোহিতা হয়েছেন যোগমায়া দেবীকে ছেড়ে—এ রহস্য শ্রীশ্রীঠাকুর কারও কাছে দীর্ঘকাল প্রকাশ করেন নি। যোগমায়া দেবীকে যে বলবেন না, সে জানা কথা। তাতে তাঁর মনে ভয় হবে, ভাব ভঙ্গ হবে—অধ্যাত্ম প্রগতির স্থলে অবনতিই হবে—গুরু মহারাজের মনে এই শঙ্কা ছিল বলেই গোপন করেছিলেন। কিন্তু তিনি মুখে কিছু না বললেও ঠাকুরগত প্রাণ ভৈরবী মায়ের বুঝতে বাকী থাকেনা, কোথায় কি যেন একটা সূক্ষ্ম গোলযোগ ঘটেছে। দিনে দিনে তিলে তিলে তাঁর ঠাকুর পর করে দিচ্ছেন তাঁকে। এটা মুখে তর্ক করে বোঝানোর জিনিস নয়, অনুভবের বস্তু। বাইরে সকলের কাছে ভৈরবী মায়ের যে রাজ-রাজেশ্বরীর মর্যাদা ছিল, ঠাকুর কোন ক্ষেত্রেই তার একতিল ক্ষুন্ন করতেন না। তবুও যোগমায়াদেবী বুঝতে পারেন প্রথম জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে অন্তরঙ্গতা পেয়েছিলেন, তা কেমন করে বুঝি তিনি হারিয়েছেন। এও ভৈরবী মায়ের পরীক্ষা সন্দেহ কি? যত দিন গেছে, কঠিন হতে কঠিনতর হয়েছে ভৈরবী যোগমায়ার পরীক্ষা এ সত্য স্বীকার না করে উপায় নাই। তিনিও অবিচলিত স্থৈর্যে তা সহ্য করে গেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরই অকস্মাৎ গুরুর কাছ হতে যে সমাদরের ঐশ্বর্য পেয়েছিলেন তাও যেমন বিনম্রচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন, এই অকারণ অনাদর তেমনি মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়েছেন আমাদের সঙ্ঘজননী। তাঁর নিরলস গুরু সেবায় কোনও কারণেই কখনও ছেদ পড়েনি, ক্লান্তি আসেনি গুরুনিষ্ঠায়।

ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন রূপে শ্রীশ্রীঠাকুর ভৈরবী মায়ের তাঁর প্রতি এই সুগভীর অনুরক্তির মর্ম সর্বদাই অনুভব করতেন। তাই ১৩২২ সালে কাশীধামের

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ গম্ভীরায় অবস্থান কালে হঠাৎ একদিন পার্শ্ববর্তিনী শৈলমা ও স্বরমাকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলে উঠেছিলেন—

"সমুদ্রের পার আছে তল আছে তার।
অগাধ অপার মাতৃস্নেহ পারাবার॥"

'যোগমায়ার স্নেহ আমার ঠিক তেমনি মনে হয়। আমি তার কূল খুঁজে পাই না। ভগবানকে কি ভাবে শ্রদ্ধাভক্তি ও সেবা করতে হয়, তোমরা ওকে দেখে তা শেখ।' ভৈরবীমা তখন সেখানে ছিলেন না। তাঁর ওসব শোনার দরকারও ছিল না। কি পেয়েছিলেন আর কি হারিয়েছেন সে তিনি নিজের মন দিয়ে বুঝতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দুটি সস্নেহ প্রশংসা বা কঠিন কথা তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারত না। কিন্তু আমাদের এসব জানা দরকার। যে সন্ন্যাসিনী তাঁর ত্যাগপুত নিষ্কাম সেবায় পরমহংস নিগমানন্দদেবের কাছ হতে এত বড় মান-পত্র পেয়েছিলেন, নিত্য প্রভাতে তাঁকে স্মরণ করলেও আমাদের চিত্ত মালিন্য দূর হয়ে যাওয়ার কথা। অসামান্যা মহিলা তিনি।

যোগমায়া দেবীর ক্রমেই বয়স বাড়ছিল। তার উপর অবিশ্রাম মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম আর সম্ভবতঃ কিছুটা মনোকষ্টের জন্যই ক্রমে তাঁর নীরোগ দেহে ব্যাধির আক্রমণ শুরু হল। আসামের জ্বর ভয়ানক। ঘুরে ফিরে আশ্রমবাসী এমন কি মঠাধিশ্বরকেও জ্বরাস্থর আক্রমণ করত। এবার যোগমাযা দেবীকেও মাঝে মাঝে জ্বরে ধরতে লাগল। সহজে তিনি ঠাকুর সেবা হস্তান্তর করতে চাইতেন না। কিন্তু দেহ তাঁর ধীরে ধীরে আরও দুর্ব্বল হয়ে গেল। সামান্য জ্বর প্রবল বিক্রমে শয্যাশায়ী করে ফেলতে লাগল। কয়েকবার এমনি চলার পরে বোধহয় ১৩২৬ সালে জ্বর হয়ে সেই যে যোগমায়াদেবী বিছানায় পড়লেন, প্রায় তিনমাস নিরবচ্ছিন্ন ভুগতে হল তাঁকে। জ্বর হয়ে দাঁড়াল প্রাণ সংকট পীড়া। জ্বর ত্যাগ হয় না, একেবারে দেহ শীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে গেল। শেষে জ্বরের প্রকোপে থেকে-থেকে ভৈরবীমা অজ্ঞান হয়ে যেতে লাগলেন। সকলের মনেই ভয়, মা কি তবে এবার চললেন? আর ভাল হবে না রোগ? রোগিনীর কষ্ট দেখে ঠাকুর



শ্রীশ্রীঠাকুরের অবশিষ্ট সন্ন্যাসিনী—সুরবালা মা

~~(১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)~~

(১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)



কাশী শ্রীশ্রীনিগমানন্দ গম্ভীরার অধ্যক্ষা—শান্তি মা

মহারাজ স্বয়ং বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর অবধৌতিক ঔষধ হার মেনেছে জ্বরের কাছে। যোড়হাটের ভাল ডাক্তার ডেকে রীতিমত চিকিৎসা চলেছে। স্বামী স্বরূপানন্দজী তখন আর মঠে থাকেন না। কাজেই বাইরের এলো-প্যাথিক ডাক্তার আনা ছাড়া উপায় ছিল না। অন্তেবাসীরা পালা করে রাত জেগে সেবা শুশ্রূষাদি করেন।

শেষে একদিন জ্বরের প্রকোপে হঠাৎ ভৈরবীমায়ের এমনই সংজ্ঞা লোপ পেল যে দেহে মৃত্যু লক্ষণ ফুটে উঠল। যোড়হাটে ডাক্তার আনতে লোক ছুটল, শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং এসে বসলেন রোগিনীর শিয়রে। তাঁর আদেশে সযত্নে নানা উপায়ে রোগিনীর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা চলতে লাগল। তিনি বললেন, যোগমায়ার মৃত্যু হয়নি, ঘোর মূর্চ্ছা হয়েছে, তাই সকলে সাহস পান। নইলে প্রবীণদের সকলেরই মনে হয়, যোগমায়াদেবী গতাসু। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে চোখ মেলে চাইলেন ভৈরবীমা, ক্ষীণস্বরে দুএকটা কথা বললেন। তাঁকে পরীক্ষা করে চিকিৎসক আশ্বস্ত হয়ে বললেন আর ভয় নাই। এবারকার মত ফাঁড়া কেটে গেল। ঠাকুর মহারাজ তখন আসন ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। কিছুদিন পরে রোগের প্রকোপ ধীরে ধীরে কমতে লাগল। যোগমায়াদেবী শয্যা ছাড়লেন ক্রমে।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ভৈরবীমা তাঁর ওই বাহ্যজ্ঞান রহিতাবস্থায় যে অতীন্দ্রিয় দর্শন করেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে তা সবিস্তারে বলেন। অদ্ভুত তাঁর সেই দিব্যানুভব।

সেবারকার অসুখে বাহ্যজ্ঞান লোপ পেলেই ভৈরবীমা দেখতেন তিনি যেন তাঁর স্থূল দেহ হতে পৃথক হয়ে গেছেন। দেহটা বিছানায় পড়ে আছে, তিনি বেশ ভাল বোধ করছেন, কোনও কষ্ট নাই। প্রায়ই এইটা হত। যেদিন সকলে মৃত্যু আশঙ্কা করছিলেন সেদিনও বাইরে জ্ঞান লোপ পেয়েছিল—ভিতরে পুরোপুরি চেতন অবস্থা। শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ এসে তাঁর মাথার শিয়রে বসলেন তাও তিনি জানেন। কিন্তু তিনি আসন গ্রহণ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ এসে ঘরে

ঢুকছেন। তাঁর হাতে মহামূল্য বসন ভূষণাদি; তিনি ভৈরবী মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমি তোমায় নিতে এসেছি। বাইরে রথ অপেক্ষা করছে। তুমি স্নান করে এই সব বেশভূষা পরে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও'। একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়াদেবীর চোখে পড়ে তার পার্থিব দেহ কুৎসিত একখণ্ড পোড়াকাঠের মত বিছানায় পড়ে আছে। তিনি এরই মধ্যে কখন যেন হিরন্ময় দেহ লাভ করেছেন। সেই বেশ-ভূষা নিয়ে স্নানান্তে উজ্জ্বল মহার্ঘ বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা হয়ে সানন্দে তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর ঘরের দরজা পর্যন্ত এসেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ খেয়াল হল 'তাই তো, আমি যে যাচ্ছি ঠাকুর এখানে রইলেন যে।'

দ্বারপ্রান্তে আসতেই অপূর্ব গঠনের একটি রথ তাঁর চোখে পড়ল কিন্তু আগের মত আর যাওযার উৎসাহ নাই। কেবলই মন বলছে 'ঠাকুর তো আমার সঙ্গে যাবেন না। তিনি যে এইখানেই রইলেন।' অথচ তাঁকে যেতেই হবে, পিছন ফিরবার বা থাকবার সাধ্য যেন নাই। কার অমোঘ শক্তি তাঁকে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে চলেছে।

অনিচ্ছায় মন্দ গতিতে এক পা এক পা করে এগিযে গিযে যোগমায়াদেবী সেই নবাগত দিব্য পুরুষের নির্দ্দেশ মত রথের রত্নাসনে গিয়ে বসলেন। অমনি সেই দিব্য পুরুষ সারথি হযে রথ চালনা করলেন, মাটি ছেড়ে দেবরথ আকাশে উঠতে লাগল। উর্ধ্ব হতে উর্ধ্ব স্তরে। যোগমায়াদেবী দেখছেন, পায়ের নীচে নদ-নদী, সমুদ্র পর্বতারণ্য শোভিতা পৃথিবীকে একখানা ছবির মত দেখা যাচ্ছে। আরও উর্ধ্বে উঠছেন তিনি, ক্রমে গ্রহ-নক্ষত্রালোকও নীচে পড়ে রইল। তাঁকে নিয়ে রথ এক অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করল এবার। তারপর সে আঁধার আবার তরল হয়ে গেল, নূতন এক আলোর রাজ্যে পড়ল রথ। তিনি চোখ মেলে পুতুলের মত এই সব আশ্চর্য দৃশ্য দেখছেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে কিছুটা বিস্ময় বোধ ছাড়া আনন্দ বা উল্লাস নাই। ঘুরে ফিরে শুধু একটি কথাই চিত্তে গুঞ্জরিত হচ্ছে, 'ঠাকুর যে সেখানে রয়ে গেলেন। কই তিনি তো এলেন না। তাঁকে দেখছি না এ রাজ্যে।'

আলোর রাজ্যের প্রান্তে এক দিব্য ভূমি। যোগমায়াদেবী ঠাকুরকে বলেন, 'ভাষায় আমি সেখানকার শোভা বলে বোঝাতে পারব না। সে দেশ আলোও নয় অন্ধকারও নয়—স্বয়ম্প্রভ এক জ্যোতির উপাদানে যেন গড়া। তারই কেন্দ্রে আশ্চর্য্য-দর্শন এক সুরম্য পুরী। তার রত্নতোরণ হতে মনিরত্ন খচিত সোপান শ্রেণী এক বর্ণনাতীত মনিমন্দিরাভিমুখে উঠে গেছে। এমন মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখেও ভৈরবীমায়ের প্রাণ কিন্তু সমানে কাঁদছে—'ঠাকুর তো আসেন নি। ঠাকুর সেখানেই রয়েছেন।'

দিব্যসারথির নির্দ্দেশে রথ হতে নেমে রত্ন সোপান বয়ে মন্দিরা-ভিমুখে এগিয়ে চলেন যোগমায়া দেবী। যত উপরে উঠছেন, দেহ যেন ততই সব বন্ধন বিমুক্ত হয়ে ক্রমেই লঘু হতে লঘুতর বোধ হচ্ছে। সোপানশীর্ষে কারুকার্য-খচিত স্তম্ভ শ্রেণী। প্রাসাদের মধ্যখানে এক স্তম্ভের অন্তরালে কোনও মনোহরাভিরাম জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ যেন নবাগতাকে অভ্যর্থনা করার জন্ত দাঁড়িয়ে আছেন বলে মনে হল। যোগমায়া দেবী সর্ব্বোচ্য সোপানে এসেই তাঁর নিরুপম দর্শন রক্তোৎপল লাঞ্ছিত পরম সুন্দর শ্রীচরণ দুখানি দেখতে পেলেন—সমগ্র দেহাবয়ব তখনও বিশাল স্তম্ভান্তরালে অদৃশ্য। তবু ভৈরবী মায়ের বোধ হল, যাঁর পাদপদ্ম দর্শন করলাম তাঁর সৌন্দর্য মাধুরী যেন ধ্যানাতীত কোনও এক অকল্পনীয় বস্তু।

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে সেই রক্তোৎপল সদৃশ চরণ-দুখানি দর্শন করছেন, এমন সময় কোথা হতে দিব্যাঙ্গনারা এসে যোগমায়া দেবীকে ঘিরে ধরলেন। সাদরে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন বিচিত্র এক মনি-মণ্ডিত স্নানাগারে। নানা উপচারে স্নান করিয়ে পূর্বের চেয়েও অতুলনীয় মহার্ঘ পরিচ্ছদে সাজিয়ে অলখশীর্ষ রত্নভূষা পরিয়ে এক অবর্ণনীয় শোভাময় প্রকোষ্ঠে এনে দেববালারা সসম্ভ্রমে যোগমায়াদেবীকে রত্ন সিংহাসনে বসালেন। ভৈরবীমা চোখ মেলে সবই দেখছেন। কিন্তু অন্তরে সেই এক ব্যাকুলতা 'কই আমার ঠাকুর কোথায়? এখানে তো নাই তিনি।'

রত্নাসনে বসার অল্পপরেই ভৈরবীমায়ের কানে এল এক সুগম্ভীর দিব্য কণ্ঠস্বর। চোখে না দেখলেও তিনি স্পষ্ট অনুভব করেন প্রাসাদমুখে যাঁর পাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য ঘটেছিল, এ কণ্ঠস্বর তাঁরই। গূঢ়দর্শন জ্যোতিরাধার সেই পুরুষ যেন তাঁর অনুচরবর্গকে অনুজ্ঞা করছেন 'যাও নবাগতাকে তাঁর স্বস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে এস।' এর কিছুক্ষণ পরেই কখন যেন যোগমায়া দেবীর চেতনা হারিয়ে গেল। আর তাঁর কিছুই মনে নাই। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরল, দেখলেন তিনি মঠে নিজের ঘরে রোগশয্যায় শুয়ে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখনও তাঁর শিয়রের কাছেই বসে রয়েছেন। যোগমায়াদেবীর মুখে তাঁর অতীন্দ্রিয় দর্শন আনুপূর্বিক শুনে শ্রীনিগমানন্দদেব প্রসন্ন মুখে বললেন, 'যা দেখেছ ঠিকই দেখেছ, তবে ঠাকুরকে এখানে ফেলে গেছ, এই অস্বস্তিটুকু যদি তোমার মনে না থাকত—যেখানে গিয়েছিলে সেখান হতে এবার আর তুমি ফিরতে না। ঐ দ্বিধার জন্যই সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে পূর্ণরূপে দর্শন করাও তোমার সম্ভব হল না। যদি ঐটুকু তোমার মনে না থাকত তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে দেখতে তিনি আর কেউ নন—তোমারই ঠাকুর। সেই আনন্দঘন চিন্ময় পুরুষকে দেখে আর কি এখানে ফিরে আসতে পারতে?' কিন্তু মুখে শ্রীনিগমানন্দ যাই বলুন, তাঁর ভাব দেখে যোগমায়াদেবী বুঝতে পারেন, তাঁর ঐকান্তিক গুরু নিষ্ঠায় তাঁর ঠাকুরের সন্তোষের সীমা নাই। বিশ্বাতীত অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যও যোগমায়াদেবীর চিত্ত হতে ঠাকুর মহারাজের ধ্রুবস্মৃতি ম্লান করতে পারে নি, একি সহজ কথা!

কিন্তু এমন অটুট গুরুনিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও জীবনের তপস্যায় ভৈরবীমায়ের সুদিন না এসে দুর্দিনই দেখা দিল। অন্তেবাসীদের নিয়ে একটা গোলযোগে একটা সেবকের প্রতি পক্ষপাত বশতঃ যোগমায়াদেবী তাঁর গুরু মহারাজের কাছেই একদা সত্য গোপন করলেন। তাঁর ঠাকুর মহারাজের কিছু জানতে বাকি রইল না। যে সেবকটির প্রতি মমতায় ভৈরবী-মা সত্য গোপন করেছিলেন, শ্রীনিগমানন্দদেবের প্রশ্নে সে নিজেই যখন দোষ স্বীকার করল মনে অত্যন্ত আঘাত পেলেন ঠাকুর। এই গুরুতর

অপরাধের পরিণামেই তিনি মঠ বাস ছেড়ে পুরীধামে শেষ জীবন কাটাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। পুরীতে আমাদের ভাগ্যোদয় হল, যোগমায়া দেবীর বৈষ্ণবাপরাধে। একেও মহামায়ার চাতুরী ছাড়া অন্য কিছু ভাবা উচিত নয়।

শৈলমা ও শান্তিমা কিছুদিন আগেই পরলোকগতা। বিমলামায়ের বিবাহ হয়ে গেছে, মহিলা বিভাগের হিরণমা ও গিরিজামাকে তাঁদের আত্মীয় গৃহে চলে যেতে আদেশ দিলেন মঠাধীশ। ভৈরবীমা ছাড়া মঠে প্রবীণা ছিলেন সুশীলামা ও করুণা মা। তিনজনেই নিরাশ্রয়, ঠাকুর ছাড়া তাঁদের ভরণ-পোষণ করার কেউ নাই। সুতরাং এই তিনজনকে মঠে রেখে মঠাধীশ ঘোষনা করলেন এদের দেহান্তে মঠাশ্রমে কোন মহিলা আর স্থান পাবেন না। মহিলা বিভাগ কার্য্যত তুলে দিয়ে ১৩২৮ সালের শেষে ব্রহ্মচারী হরিদাস ও সন্ন্যাসিনী সুরবালাদেবীকে সেবক সেবিকারূপে সঙ্গে নিয়ে শ্রীনিগমানন্দদেব পুরী এসে সেখানেই বৎসরের অধিকাংশ সময় থাকবার ব্যবস্থা করলেন।

যাঁরা আসাম মঠে ভৈরবী মায়ের দিনযাত্রা দেখেছিলেন কেবল তাঁরাই বুঝবেন যোগমায়াদেবীর পক্ষে এ কত বড় শাস্তি। সকাল চারটা হতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত যাঁর কেবল ঠাকুর সেবার আয়োজন নিয়েই দিন কাটত হঠাৎ তাঁর জীবন কর্ম্মশূন্য ও অর্থহীন হয়ে গেল। এ আঘাত সাধারণ লোকের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। কিন্তু ঘাত-প্রতিঘাতে ভৈরবী মায়ের চিত্ত পুরুষের মত সুদৃঢ় ছিল। গুরুদত্ত দণ্ড নীরবে মাথা পেতে নিয়ে তিনি 'ঠাকুরের' মঠায়তন আগলিয়ে মঠেই পড়ে রইলেন। দিন গুনতে লাগলেন, কবে ঠাকুরের রাগ কমবে। মঠ ছেড়ে বেশীদিন কি ঠাকুর দূরে থাকতে পারবেন? এই মঠ যে তাঁর দ্বিতীয় প্রাণ!

যোগমায়াদেবীর ধারণা মিথ্যা নয়। ১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসে খবর এল ঠাকুর মঠে আসছেন। অল্পবয়সী ব্রহ্মচারী সেবকদের ডেকে এনে ভৈরবী মা করুণ স্বরে বললেন, 'বাবা তোরা দু'একজনে এবার সকলসময় ঠাকুরের কাছে কাছে থাকিস। আমার উপর রাগ করেই ঠাকুর মঠ ছেড়ে গেছেন,

এসে যদি আমার সেবা আর নিতে না চান?' এই কথা ক'টি শুনলে মনে কষ্ট হয়। যাঁর সেবায় শ্রীনিগমানন্দদেবের এতকাল তুষ্টি পুষ্টি ঘটেছে, সেই তিনিই আজ সসঙ্কোচে ভাবছেন 'আমার সেবা ঠাকুর নেবেন তো'? ভাগ্যের কি পরিহাস! সেই সঙ্গে শ্রীনিগমানন্দদেবেরও একটা নূতন পরিচয় মেলে। সত্যই মায়া-মোহ পরিশূন্য নির্ম্মম সন্ন্যাসী তিনি—সেবা-যত্ন স্নেহ-ভালবাসা আত্মনিবেদন কোন কিছুরই কি বন্ধন নাই তাঁর! কেবল সত্য এবং ন্যায় ছাড়া আর সব কিছু সম্বন্ধেই তাঁর চিত্ত নির্মোহ!

সন্দেহ কি পরমহংস নিগমানন্দ ছিলেন নিত্য মুক্ত স্বভাব শুদ্ধ পুরুষ। কিন্তু তিনি "কেবলী" নন, 'প্রেমী পরমহংস'। মহাজ্ঞানের শীর্ষ বিন্দুতে আরোহণ করেও গুরু ভার স্বীকার করে পরম প্রেমে জীব জগৎকে 'আমার' বোধে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তাই সদ্গুরুর বিচার তো সাধারণ মানুষের মত মনের খেয়ালে বিচার করা নয়, তা সত্য স্বরূপের ন্যায় বিচার। যোগমায়া দেবী মোহবশে যে অপরাধই করে থাকুন, তাঁর সর্ব্বস্ব দিয়েই দুর্গাপুর আশ্রমের সমৃদ্ধি ঘটেছিল—বিপথগামী স্বামী গুরুদ্রোহী হলে, যে ভৈরবী মা ঘরে ফিরে না গিয়ে বরং ভিখারিনীর জীবন যাপনও করতে প্রস্তুত ছিলেন ঠাকুর কি সে সবভূলে যেতে পারেন? সব চেয়ে বড় কথা, শুদ্ধ আধার বলে দীর্ঘ আট বৎসর কাল জগদীশ্বরী যাঁর দেহ আশ্রয় করেছিলেন, পরমহংস নিগমানন্দদেব কি কখনও তাঁর অমর্য্যাদা করতে চাইবেন? তাই কয়েক মাস পরে মঠে ফিরে তিনি আবার আগের মতই ভৈরবী মায়ের সেবা পরিচর্য্যা অঙ্গীকার করলেন। যোগমায়া দেবীর আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হল। বাইরে থেকে দেখে আগের সঙ্গে ঠাকুর মহারাজের সেবার-কার আচরণের কোনও পার্থক্যই কেউ ধরতে পারলনা। কেবল এইটুকু প্রভেদ ঘটল যে, আসাম মঠ আর ঠাকুরের মূল আবাসস্থলী রইল না; পুরী ধাম সে স্থান অধিকার করল। মঠে চিরদিন যোগমায়াদেবীর তত্ত্বাবধানেই ঠাকুরের সেবা পরিচর্য্যা সুসম্পন্ন হত। সুতরাং ঠাকুর মঠ ছাড়লেও আসাম মঠে মঠাধিষ্ঠাত্রীরূপে ভৈরবী মায়ের একাধিপত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত রইল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সংরক্ষিত এই মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত হত ভৈরবী মায়ের একেকটি অলৌকিক বিভূতি। তার ফলে আসাম মঠে বরাবর শ্রীশ্রীঠাকুরের পরই পূজনীয়া মঠের মা। প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ মায়ের এরকম একটি বিভূতির কথা প্রকাশ করেছেন।

একবার মঠের কোন উৎসবে রাত্রিবেলা শ্রীশ্রীঠাকুরের লুচি ভোগের ব্যবস্থা হল। উৎসবে ঠাকুর ভোগে যা হত অন্তেবাসী সকলেও সেই প্রসাদ পাবেন, এই ছিল ঠাকুরের নিয়ম। অন্য দিন ঠাকুর ভোগ এবং সেবকদের আহার্য্যের পার্থক্য থাকলেও উৎসবে সকলেরই এক ব্যবস্থা। কাজেই আশ্রমবাসী ও সমাগত ভক্ত শিষ্যদের সবার জন্যই প্রচুর পরিমাণে লুচিভাজা হয়েছিল, পায়েস মিষ্টি ডাল তরকারীরও অভাব নাই। ঠাকুরের ভোগ শেষ হয় হয়, এমন সময় বাইরে থেকে অনেক ভক্ত এসে গেলেন। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে আশ্রম সেবক ও নবাগত ভক্তদের এক সঙ্গে খেতে বসিয়ে দিলেন। সকলে তৃপ্তি পূর্বক প্রসাদ গ্রহণের পর দেখা গেল পায়েস তরকারী যথেষ্ট থাকলেও একটি ছোট চুবড়িতে কয়েক খানা লুচি পড়ে আছে। রাত্রি অনেক হয়েছে সারাদিনের পরিশ্রমের পর নতুন করে ময়দা মেখে লুচি করার আগ্রহ কারও নাই। প্রজ্ঞানন্দজীসহ সন্ন্যাসীরা কয়েকজন রাত্রে লুচি খাওয়ার আশা ত্যাগ করে মুড়ি তরকারী ও পায়েস খেয়েই শুয়ে পড়া স্থির করছেন, এমন সময় কার কাছ হতে যেন ভৈরবীমা এ খবর জানতে পারলেন। তিনি তখনই মহারাজদের ডাকিয়ে তাঁর ঘরে এনে তাঁদের সেখানে পাতা করে বসতে বললেন। একটি সেবককে দিয়ে পায়েস, তরকারী ও লুচির সেই ছোট্ট চুবড়িটি আনিয়ে মা নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াতে আরম্ভ করলেন। সন্ন্যাসীদের মধ্যে সম্ভবতঃ প্রজ্ঞানন্দ, চিদানন্দ, নির্বাণানন্দ, প্রেমানন্দ এবং শুদ্ধানন্দ মহারাজই ছিলেন অন্তর্ভুক্ত। আশ্চর্য্যের কথা, সকলে সে রাত্রে পেট ভরে লুচি তরকারী খেয়ে পাতা ত্যাগ করে উঠলেন যখন, দেখা গেল সেই ছোট্ট চুবড়িতে আরও খান তিন চার লুচি পড়ে আছে। সবাই খাওয়ার পরও ফুরায় নি। 'মা এটা কি

করে হল?' উত্তরে ভৈরবীমা হাসতে লাগলেন, 'হবে না কেন? দৃষ্টি ক্ষুধায় তোমাদের মনে হচ্ছিল ওই কয়খানা লুচিতে কি আর পেট ভরবে?" কিন্তু কথাটা কেউ-ই বিশ্বাস করলেন না। নিজেদের খাওয়ার পরিমাণ জানেন না তাঁরা? চুবড়িতে যৎসামান্য যে কয়খানা লুচি ছিল, তা বড় জোর দুই জনের মত। চার পাঁচ জনের পেট ভরতেই পারে না তাতে। এ কেবল ভৈরবী মায়েরই দৈবী শক্তি।

আরেকবার মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মঠে নাই। মা কিছুই খেতে পারেন না, ভারী অরুচি। একদিন ব্রহ্মচারী ছেলেদের বলে পাঠালেন 'একটা পেয়ারা এনে দিতে পারিস্!' সময়টা একেবারেই পেয়ারার সময় নয়। মঠে শীত কালে পেয়ারা সাধারণতঃ ফলত না। তবু যদি দু'একটা মিলে যায় ভেবে ব্রহ্মচারী নৃসিংহচৈতন্য পেয়ারা বাগান খুঁজতে যান। যোগমায়াদেবী নিজে মুখ ফুটে পেয়ারা খেতে চেয়েছেন, আর তারা তা দিতে পারবেনা ভেবে নৃসিংহ ব্রহ্মচারীর বড় কষ্ট হয়। অন্তেবাসীদের মধ্যে ইনি বোধ হয় ভৈরবীমাকে সবচেয়ে ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। মনঃক্ষুন্ন ভাবে পেয়ারা বাগান খোঁজা খুঁজি করতে করতেই একটু পরে এক জোড়া আধপাকা পেয়ারা চোখে পড়ল। ঠিক যেমনটি পেয়ারা রসিকরা দেখতে ভালবাসেন। এ মায়েরই করুণা মনে করে খুশী মনে নৃসিংহ ব্রহ্মচারী পেয়ারা দুটি তুলে তখনই ভৈরবীমাকে দিতে গেলেন, যত আনন্দ ছেলের, ততই আনন্দ মায়ের। এমন সময়ে পেয়ারা মিলেছে সকলেই আশ্চর্য্য হলেন।

ব্রহ্মচারী নৃসিংহ সাড়ে চার বছর বয়সে আসাম মঠে এসেছিলেন। ঐ ছোট্ট বালকটির প্রতি ভৈরবী মায়ের বড় স্নেহ ছিল। ছেলেটিও ত'াকে সাক্ষাৎ ভগবতী জেনে ভক্তি করত, ভালবাসত। প্রথম যুগে মঠে যে খাওয়ার দুর্দ্দশা ছিল তা যোগানন্দ প্রমুখ প্রাচীনরা বলেছেন। প্রায়ই কেবল কলমীর ঝোল ভাত কিংবা পাতলা হলুদ গোলা জলের ডাল আর মোটা চালের ভাত সবাইকে খেতে হত। নৃসিংহ পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চ-মধ্যবিত্ত

ঘরের ছেলে, তায় সবার ছোট, সুতরাং বাড়ীতে তার যে খাওয়ার কত পরিপাট্য ছিল সে কথা বলা বাহুল্য। সেই ছেলে মঠে এসে প্রতিদিন ঐ খাদ্য খেয়ে প্রথম দিকে একেবারে অস্থিচর্ম্ম সার হয়ে গিয়েছিল! মায়ের কোলছাড়া হয়ে ভৈরবীমাকে সে মা বলে জেনেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানত সাক্ষাৎ ভগবান। ভৈরবীমা লোকের কাছে সগৌরবে বলতেন, 'আমার নরসিংহ (নৃসিংহ) মরবার মত দশায় পড়েও মঠের সেই ঝোল ভাত খেয়েই তো বড় হয়ে উঠেছে। কঙ্কালসার পাঁচ বছরের ছেলে ও। কিন্তু ওইটুকু কচি ছেলে পথের ধারে পাকা পেয়ারা কুড়িয়ে পেযে নিজে না খেয়ে আমায় এনে দিয়েছিল। বললাম তুই খা বাবা। তা ছেলে আমায় বলল কি, 'মা ঠাকুর ভোগে দাও। তারপর তো প্রসাদ পাব, এত ভাল আমার নরসিংহ।' গল্পটা ঠাকুরও বহুজনের কাছে করতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পুরীবাসী হওয়ার পর তাঁর সেবায় বঞ্চিত হয়ে যোগমায়া দেবী বুভুক্ষিত হৃদয়ে ওই সব মাতৃভক্ত ছেলেকেই দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন। বিনিময়ে তিনিও তাদের কিশোর চিত্তের অকপট ভক্তি ভালবাসা পেয়েছিলেন। ভৈরবীমাকে এরা প্রত্যেকে চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছেন। মঠ ছেড়ে গেলেও তাঁদের অন্তর মন্দিরে ভৈরবীমায়ের আসন পাতা ছিল।

ঠাকুর মহারাজ মঠ ছেড়ে যাওয়ার কয়েক বৎসরের মধ্যেই যোগমায়া দেবীর অটুট স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল। জরা ও ব্যাধি যুগপৎ প্রবলভাবে আক্রমণ করল তাঁকে। ঠাকুর যে তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েই মঠের বাস উঠিয়ে প্রবাসী হলেন, ভৈরবী মায়ের এ বড় মর্ম্মান্তিক আঘাত। সুতরাং দেহে মনে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

অন্তেবাসীদের মধ্যে সঙ্গোপনে এর প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর মঠের মায়ের উপর রুষ্ট হয়েই মঠ বাস ছেড়ে দিয়েছেন, যাঁরা এটা বুঝতে পেরেছিলেন, সেই সব বয়স্ক অন্তেবাসীদের কাছে মায়ের মর্যাদা যে ক্ষুন্ন হয়েছিল তা বোঝাই যায়। বাইরে ঠাকুর মহারাজের বিচক্ষণতায়

মায়ের প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন না হলেও ভাবের দিক থেকে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য কিছুটা কমে গেল। যোগমায়াদেবীর অনেক ব্যবহারই তাঁরা সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। বস্তুত এটা হল ঠাকুরের ভাষায় 'খোদার উপর খোদকারি'। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিচারে মঠে তাঁর পরই পূজ্যগুরুজন হলেন সন্ন্যাসিনী ভৈরবী যোগমাযা। মঠের মায়ের সেবাপরিচর্যা ও অবিচারে আদেশ পালনই অন্তেবাসীদের কর্তব্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশের সঙ্গে বিরোধ থাকলেও এক সেই ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে ভৈরবী মায়ের আদেশ অবশ্যই পালনীয়। তাঁর সমালোচনা ঠাকুরের মতে অন্তেবাসীদের অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু ঠাকুরেব অনুপস্থিতির সুযোগে অন্তেবাসীরা সেই অপরাধই করে বসলেন। মঠের মায়ের কোন ব্যবহারের সমালোচনা তাঁদের পক্ষে অনধিকার চর্চা। এটা ভুলে তারা ভৈরবী মায়ের প্রতি এক যোগে বিরূপ হয়ে উঠলেন। তাঁদেব অভিযোগ মঠের মা অপক্ষপাতে সেবকদের প্রতি সুবিচার করেন না। তাঁর অন্যায় পক্ষপাত আছে কারও কারও প্রতি, আবার কারও-কারও প্রতি বিনা কারণেই বিরূপ তিনি। মঠাধিষ্ঠাত্রীর এরকম পক্ষপাতিত্ব কেন থাকবে? অন্তেবাসী নরসিংহ ব্রহ্মচারী—এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিযেছেন।

১৩৩২ সাল। ভৈরবীমা প্রায় মরণাপন্ন আশঙ্কায় ঠাকুর মহারাজকে পরপর দুই-তিন খানা টেলিগ্রাম করা হয়। টেলি পেয়ে ঠাকুর এসে পড়লেন। তিনি আসার দুই একদিনের মধ্যেই মঠের মায়ের অবস্থার উন্নতি হল। বোঝা গেল এ যাত্রায় মা যাবেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেও মঠে এসে সেকথা বললেন 'তোমাদের আর্জেন্ট টেলি পেয়ে মনে ভয় হল, তবে কি গিয়ে আর যোগমায়াকে দেখতে পাবনা? তারপর বুঝলাম, না ওঁর যাওয়ার এখনও দেরী আছে।' ভৈরবী মা একটু সুস্থ হয়ে উঠেছেন দেখে মঠের আভ্যন্তরীন গোলযোগের মীমাংসায় মনদিলেন ঠাকুর।

গোলযোগ বেশ জটিল আকার ধরেছিল। কেবল ভৈরবীমায়ের সমালোচনা নয়, সেই উপলক্ষ্যে ঠাকুর মহারাজের প্রতিও কটাক্ষ ছিল। দুই

তিন জনের মনে এরকম ধারণা ছিল যে ঠাকুরের অন্যায় প্রশ্রয়েই যোগমায়া দেবীর এত প্রতাপ। শ্রীশ্রীঠাকুর মোহবশে ভৈরবী মাকে সমর্থন করতেই সেবকদের প্রতি যদৃচ্ছা বিসদৃশ ব্যবহার করেন মঠের মা। গুরুকৃপায় মঠে তখন একমাত্র নরসিংহ ব্রহ্মচারীই ছিলেন যোগমায়া দেবীর একনিষ্ঠ অনুগত একমাত্র সন্তান। সকলের সব অভিযোগ শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন সর্ব্বশেষে বললেন—'নরসিংহ তোর কি বলবার আছে শুনি?' তখন তিনি নির্ভয়ে সকলের সম্বন্ধে তাঁর কি অভিমত তা জানিয়ে নিজে যা সত্য বলে জানতেন তা সবিস্তারে ঠাকুরের কাছে বললেন।

এরপর ঠাকুর রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করলেন। প্রলয় বিষাণ যেন গর্জে উঠল—"ডাক সবাইকে। সব আমি বিদায় করব।" সবাই এল। ঠাকুর বলতে লাগলেন "মাকে তোমরা চিনলে না? মা শুধু একজন স্ত্রীলোক? মায়ের শক্তিতে আমি মুগ্ধ—তা নয়, শক্তির মহিমায় আমি তার কাছে নতি স্বীকার করি, মাতৃশক্তির সাহায্যে রচিত এ আশ্রমের ভিত্তি। ঐ মায়ের সর্ব্বস্ব দিয়েই এ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। সেই মাকে তোমরা বল মেয়েমানুষ। আরে, ঐ মেয়েমানুষের পেট থেকে যে বেরিয়েছিস রে।"

এই তিরস্কার হতে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যোগমায়া দেবীর মধ্যে সাক্ষাৎ জগদীশ্বরীর অধিষ্ঠানকেই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাধান্য দিতেন। তাঁর মানবীজনোচিত দোষত্রুটী কেবল ঠাকুরেরই বিচার্য্য, অন্য কারও পক্ষে ভৈরবী মায়ের সমালোচনা অক্ষমনীয় ধৃষ্ঠতা! শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন আরো বললেন 'মায়ের দোষেই ছেলেগুলি গোল্লায় গেল এই তোমাদের ধারণা? মায়ের জন্য আশ্রমের সব নাশ হতে চলেছে? জানবি প্রেমই জগতের একমাত্র শক্তি। আর কিছুতে যা না হয়, প্রেমে তা হয়—ওই মায়ের ভালবাসা আছে বলেই কচি কচি ছেলেগুলি বেঁচে আছে। মাকে আজ আশ্রম হতে নিয়ে যাই, দেখবি একমাসের মধ্যে আশ্রম শ্মশান হয়ে গিয়েছে। মা তোমাদের কাছে শুধু ঠাকুরের শিষ্যা, না হয় প্রধান শিষ্যা, মা লেখা পড়া জানেনা, তাই তোমাদের শিক্ষার মূল্য বোঝেনা, তোমরা মাকে চিনলে না? আর

সঙ্কীর্ণ স্নেহ ঐ মায়ের? আমি তাতে বদ্ধ হয়ে আছি? এটা বুঝিস না যে আমাকে বেঁধে রাখবার ক্ষমতা যাঁর আছে সে কত শক্তিময়ী। তার স্নেহ যদি সঙ্কীর্ণ হত তাহলে ১৭ বৎসর বয়স হতে যে তার কাছে মানুষ, সেই চণ্ডীকে শুধু একটি কথার জন্যে সে বের করে দিল কি করে, কিছুই বোঝনি তোমরা। অহং-এ ভিতর পরিপূর্ণ তোমাদের। যাও, সব বেরোও এখান থেকে, কাউকেই আমি চাই না, দূর হয়ে যাও, আশ্রম ভেঙ্গে যায় যাক।'

পায়ে ধরে ক্ষমা চান অন্তেবাসীরা। ভৈরবীমা ঠাকুরের সঙ্গে পুরী চলে যেতে চেয়েছেন শুনে ম্যানেজার শুদ্ধানন্দজী প্রবল আপত্তি করেন। অন্য সকলেও অনুতপ্ত হয়ে তাঁকে মঠে রাখার জন্যে মিনতি জানান। শ্রীশ্রীঠাকুরের রাগ ছিল খড়ের আগুন। দপ্ করে জ্বলে উঠে অগ্নিকাণ্ড ঘটালেও নিভে যেতে দেরী হতনা, সবাই ক্ষমা চাইতেই শান্ত হলেন তিনি। ছেলেদের অনেক উপদেশ দিলেন। মঠের মঠাধ্যক্ষ নির্বাচন করলেন শান্ত প্রকৃতি ধীর স্থির ব্রহ্মচারী বরদাকে। সর্ব্বশেষে নরসিংহ ব্রহ্মচারীকে উদ্দেশ্য করে বললেন "নরসিংহ—তোমার সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী চিন্তা ছিল। ছোট বেলা হতে আশ্রমবাসী হয়েও তুমি অধঃপাতে যাচ্ছ এই ছিল আমার চিন্তা। কিন্তু আজ আমার সব চিন্তা দূর হয়ে গেল, তোমারও কলুষ দূর হল। আজ আমি বলছি, তোর আশ্রমবাস সার্থক। তুমি সর্ব্বপাপ বিমুক্ত, তুমি মনুষ্যত্ব লাভ করবে, দেবত্ব পাবে, তোমার সব হবে।"

এই ঘটনা হতে নিঃসংশয়ে বোঝা যায় যোগমায়াদেবীর কি অসামান্য মর্য্যাদা ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। যাঁরা মঠের মায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন তাঁরা গুরুকৃপা বঞ্চিত হতভাগ্য। এর পর হতে যতদিন ঠাকুর মহারাজ স্থূলে প্রকট ছিলেন, মঠে মায়ের কোন রকম অসম্মান আর হয়নি। মঠের কর্ম্মী সেবকরা প্রথম হতেই ভৈরবী মায়ের অনুগত ছিলেন।

বিদ্যাবুদ্ধির বড়াই তাঁদের নাই বলেই সন্দেহ সংশয়ও ছিল কম। জাতি বর্ণ বা সাধন-ভজনের অভিমান তাঁদের বুদ্ধিকে মলিন করত না। তাঁরা

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাবাক্য পেয়েছিলেন 'আমাতে আত্মসমর্পণ আর আমার কর্ম্মে আত্মবিসর্জ্জন একই কথা, তাই একমনে গুরু মহারাজের প্রীত্যর্থে কৃষি বিভাগ, প্রেস, গো-সেবা ইত্যাদি নিয়ে দিনরাত কাটাতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরেরও কম প্রশ্রয় ছিল না তাঁদের সম্বন্ধে। অন্তেবাসীদের মত কঠোর নিয়ম সংযমে কর্ম্মীদের তিনি বাঁধেন নি। তাঁর চিঠিতে আছে কর্ম্মীরা কেউ তামাক খায়, কেউবা পান.জর্দ্দার ভক্ত বা গাঁজা খায় একটু আধটু। খাওযা শোওয়ার অত নিয়ম মানে না। কিন্তু কাজ করে ভাল। কর্ম্মী সেবকদের ওই যা সামান্য দোষ গণ্য করলে তো মঠাশ্রমে কর্ম্মী পাওয়াই কঠিন। সুতরাং সবই কিছুটা ক্ষমার চোখে দেখতে হবে। তিনি মঠে সেইভাবেই দেখতেন কর্ম্মীদের। তাই যোগমায়াদেবীরও কর্ম্মীদের প্রতি পক্ষপাত ছিল। এরা ঠাকুরের কোনও দোষ কখনও দেখতেন না, ভৈরবীমাকে দেখতেন সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী। ফকিরদা (স্বামী তুরীয়ানন্দ) এমনই একজন কৃষি বিভাগের কর্ম্মী।

মায়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,—শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন ভৈরবী মায়ের প্রাণ। মঠের সবচেয়ে ভাল ফলটি, সবচেয়ে ভাল ফুলগুলি কি করলে ঠাকুর সেবায় লাগবে—এ-ভাবনা ছাড়া তাঁর আর অন্য ধ্যান জ্ঞান ছিল না। আমাদের ঠাকুরকে তিনিই তো হাতে করে গড়েছেন। আমরা ঠাকুরকে নিজ মুখে বলতে শুনেছি 'আমার এ দেহটাও যোগমায়ার গড়া।' কি করে শীর্ণকায় বিশুষ্ক মূর্ত্তিকে স্থূল কলেবরে পরিণত করেছিলেন মা, ফকিরদার দেওয়া সে বিবৃতি আগেই উল্লেখ করেছি। অস্থিচর্ম্মসার পরমহংস নিগমানন্দদেব যে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় তিনমন ওজনের মহাবপুমান হয়েছিলেন, তাতে ঠাকুরের যতই আপত্তি থাক এবং ভক্ত-শিষ্যদের তা যতই অপছন্দ হ'ক না কেন—মায়ের সেটা খুব আনন্দের বিষয় ছিল।

বস্তুত এ কথা সত্য যে বহির্জ্জগতে বিগ্রহের বিচারে শ্রীনিগমানন্দদেবকে সাক্ষাৎ বিরাট পুরুষে রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব যোগমায়া দেবীরই প্রাপ্য। শ্রীগুরু তো রামেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নন; তিনি যে 'রজত গিরিনিভ' সদাশিবরূপ মহামহেশ্বর। বিপুল বলশালী বিশালদেবের প্রতীক গিরিরাজ হিমাচল;

গুরু মহিমায় পরমহংস নিগমানন্দদেবকেও যেন অমনই শাল-প্রাংশু মহাভুজ-উন্নত বরবুর্বর-বিগ্রহ না হলে মানাত না। পুরাণ পড়ে দেখ, প্রাচীন পুঁথির চিত্র দেখ, পট দেখ, ঠিক মিলে যাবে আমার ঠাকুরের রূপের সঙ্গে। এই ছিল মঠের মায়ের মনোভাব। মঠের কর্মী সেবকরাও এই মত পোষণ করতেন। মঠাধীশ্বরকে তো অমনই সচল পর্বততুল্য লাগার কথা। নইলে লোকে মানবে কেন?

ফকিরদার কাছে আর একটা মজার ব্যাপার শুনেছি, যোগমায়াদেবীর সঙ্গে আসাম মঠে প্রেত-যোনিদের উপদ্রব। এক রাত্রে তিনি নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছেন, ঠাকুর তাঁর শয়ন মন্দিরে নিদ্রামগ্ন। হঠাৎ ভৈরবী মায়ের ঘুমের ঘোর ভেঙে গেল, যেন শীত শীত করছে। বালিশ হতে মাথা তুলে দেখেন তাঁর ঘরের জানালা ও দরজা দিয়ে কারা যেন ঘরে ঢুকছে। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন ভৈরবীমা, 'ঠাকুর! ও ঠাকুর! ওই দেখুন ঘরে কারা সব ঢুকেছে।' শ্রীশ্রীঠাকুরের গাঢ় নিদ্রা কমই হত। লঘু নিদ্রাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তৎক্ষণাৎ তিনি সুপ্তোত্থিত হয়ে সাড়া দিলেন, 'কি হ'ল যোগমায়া? কি বলছ?' ভৈরবীমা দেখেন, যারা ঘরে ঢুকেছিল দুড়দাড় করে পালাচ্ছে। ধুপ্ধাপ্ বন্ধ হয়ে গেল দরজা জানালা। উঠে বসে বললেন, 'রাত্রিবেলা জ্বালাতন! এক পাল বাঁদরের মত কারা যেন জানালা দরজা ঠেলে ঢুকেছিল, আপনাকে ডাকতেই পালিয়েছে।' শ্রীশ্রীঠাকুর শুনেই বললেন, 'কারা আর! খালের ধারে শিমুল গাছে, জঙ্গলে বড় বড় গাছে যারা ঝোলে, তারাই এসেছিল। আর আসবে না শুয়ে পড়।' মাঝে মাঝে নাকি এরকম হত। আসাম মঠে যে ভূতের আড্ডা ছিল সে কথা আমরা সবাই শুনেছি। ভয়াবহ সব কাহিনী। শ্রীশ্রীঠাকুর ঠিক প্রমথাধিপতির মত তাদের পদানত রেখেই মঠে বাস করতেন।

আর একদিন রাত্রি বেলা সব কাজ সেরে ভৈরবীমা মঠ পরিদর্শনে বের হয়েছেন। সকলের খাওয়া হল কিনা, অতিথি বা আগন্তুক কেউ অভুক্ত আছে কিনা, বিশেষ করে সেটি দেখাই ছিল মঠের মায়ের কাজ।

সে রাত্রে ভিতর বাড়ী হতে বাইরের দিকে এসেই যোগমায়াদেবী দেখলেন খালের দিকে বন-বাগানের মধ্যে সাদা কাপড় পরা কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। 'কে ওখানে?' বলে মঠের মা তাঁকে সম্ভাষণ করতেই লোকটি একটু পিছিয়ে গেল। 'কে বাবা তুমি! নতুন লোক?' বলে ভৈরবীমা এগিয়ে যান, সে লোকটি আরও দু'একপা সরে যায়। 'খাওয়া হয়েছে তোমার? কোথা থেকে এসেছ বাবা!" যোগমায়াদেবী উত্তর না পেয়ে ধরে নিয়েছেন এ বাইরের লোক। মঠের কেউ হলে এতক্ষণ কাছে আসত। ভৈরবীমা যত এগোচ্ছেন, লোকটা ততই বনের মধ্যে সরে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখনও ঘুমান নি। ঘরে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। মায়ের কথা শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছ যোগমায়া? কে ওখানে?' ভৈরবীমা সবিস্ময়ে দেখেন, ঠাকুর কথা কয়ে উঠতেই লোকটা আর একপা পিছিয়ে গেল, পরমুহূর্তে আর নাই। ব্যাপার বুঝে ভৈরবীমা ঘরে ফিরে বলেন, 'কি কাণ্ড! আমি বলি মানুষ একটা। কি করে জানব ওটা ভূত। আরেকটু হলেই তো বাগানে ঢুকে পড়তাম ওকে ধরতে। তখন খালে ঠেলে ফেলত হয়ত।' শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন, 'অত সাহস হ'ত না।'

১৩৩৪ সালে অন্তেবাসীদের শেষবারের মত মায়ের মহিমার পরিচয় দেওয়ার জন্যেই বোধ হয় একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে মঠে একবার ভক্ত-সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হোক, এটি ঠাকুরের বিশেষ ইচ্ছা ছিল। ১৩৩৪ সালে মঠ পরিচালকবৃন্দ এই ইচ্ছাকে রূপ দেওয়ার জন্য বিরাট ভাবে সম্মিলনীর আয়োজন করলেন। অন্য সব ব্যবস্থাই হল, কিন্তু অভাব হল পাচকের। সাধারণ ভক্তদের জন্য ব্রাহ্মণ পাচক চাই দুই তিন জন। অন্তেবাসী ব্রাহ্মণ সেবকদের এত রকম দায়িত্ব আছে যে তাঁদের মধ্যে তিনজনকে এ-কাজে নিলে অন্য কর্ম্মযজ্ঞ পণ্ড হবে। এই সময় অশ্বিনী কুমার ভট্টাচার্য, বিহারীমোহন শর্ম্মা, মহেন্দ্র শর্ম্মা—তিন জন গৃহী ভক্ত-শিষ্য সাগ্রহে পাকের ভার গ্রহণ করলেন।

সেবার সম্মিলনীতে অভূতপূর্ব্ব লোক সমাগম হয়েছিল। সুতরাং পাক যজ্ঞও চল্‌ল সারাদিন ধরে। পাচক তিনজনই যুবক ব্রাহ্মণ সুতরাং মহোৎসাহে তাঁরা ঠাকুরের সেবা মনে করে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। প্রসাদ গ্রহণের অবসর নাই। কাজের চাপে তা মনেও নাই। কর্ম্মকর্ত্তারাও এত ব্যস্ত যে পাচক তিনটিকে ডেকে খাওয়াবার কথা তাঁদের খেয়াল্ হয়নি। রাত্রের খাওয়া শেষ হয়ে গেল এক সময়। ক্লান্ত দেহে সমাগতবৃন্দ সুপ্তি মগ্ন। জেগে আছেন অন্তেবাসীরা আর পাচক তিনজন। রাত্রের রন্ধনপর্ব্ব তাঁরা শেষ করতে পেরেছেন এই আনন্দে তিন পাচক আত্মহারা। তাঁরা পরদিনের পাকযজ্ঞের আয়োজনে ব্যস্ত। চাল, ডাল, তরকারি, মশলাপত্র, কাঠ ইত্যাদি কি পরিমাণে লাগবে সারাদিনে সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই ভাণ্ডারীর কাছ হতে সে সব সংগ্রহ করে পাক ঘরে সাজাচ্ছেন তাঁরা। এমন সময় ডাক এল 'দাদারা শীঘ্র বাইরে আসুন।' 'এই যাচ্ছি' বলে হাতের কাজ শেষ করতে গিয়ে তাঁরা বাধা পান 'এখনই আসুন দাদারা—কাজ পরে হবে।' ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি তিনজন বাইরে এলেন, কিছু অন্যায় হল নাকি? এত ডাকহাক কেন? বাইরে আসতেই মঠাধ্যক্ষ নির্ব্বাণানন্দজী এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীরা সক্ষোভে বললেন- "আপনারা সারাদিন প্রসাদ পাননি! অনাহারে এত পরিশ্রম করছেন। বড় অপরাধ হয়েছে আমাদের।' প্রত্যেকের হাতেই খাদ্য সামগ্রী। নির্ব্বাণানন্দজী এনেছেন আসন ও পাতা। তাড়াতাড়ি তিনজনকে সাদরে বসিয়ে পেট ভরে খেতে দেন সন্ন্যাসীরা। শোনা গেল কিছুক্ষণ আগে ভৈরবী মায়ের আহ্বানে মঠাধ্যক্ষ তাঁর কাছে গিয়ে দেখেন, মা রাগে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বকাবকি করছেন তাঁর সেবকদের। মঠাধ্যক্ষ যেতেই বললেন 'তোরা সবাই খেলি আর আমার তিনটা ছেলে না খেয়ে রান্না করছে? কেউ খোঁজ নিস্‌নি?' ভিতর বাড়ীতে বসে মা কি করে এ সংবাদ পেলেন ভেবে অবাক হয়ে যান সবাই।

একদিকে এই মাতৃমহিমা অন্যদিকে ঠাকুরের সব কিছুর প্রতিই অকৃত্রিম



শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সমাধি পীঠ ও প্রাতঃ স্মরণীয়া মা যোগমায়া স্মৃতিমন্দির
(হালিসহর)



শ্রীমৎ স্বামী ভূবনানন্দ সরস্বতী

(১৩৪২ বঙ্গাব্দ)

প্রীতি এই-ই ভৈরবী মাষের বৈশিষ্ট্য। ১৩৩৭ সালে প্রেস বিভ্রাটে মঠ হতশ্রী হযে পড়ায় কর্ম্মদক্ষ ও তেজস্বীস্বভাব প্রজ্ঞানন্দজীকে ঠাকুর মঠ পুনর্গঠনের ভার দেন।

প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ স্থির করলেন আসামের প্রবল বন্যা ও প্রচণ্ড বর্ষায জীর্ণদশায উপনীত গুরুব্রহ্মের আসন-মন্দির এবং তার দুই পার্শ্বস্থ ঠাকুরের ও ভৈরবী মাযেব বাসগৃহ পাকা দালান করে দেবেন। যে কথা সেই কাজ। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি আদায করে নিজেই মহোৎসমে ঘুরে ঘুরে এবং অনবরত চিঠি লিখে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি নিজ সঙ্কল্পকে বাস্তবে রূপ দিলেন। মঠের এই সমৃদ্ধিতে ভৈববীমা কিন্তু একটুও খুশী হলেন না। অসন্তুষ্ট চিত্তে বললেন, 'এইসব মাটির ঘর ঠাকুরের কতকালের বাসস্থান। তাঁর পাযের ধূলায় পবিত্র এই মাটি। খড়ের দেওয়ালে যোগেন প্রিয়নাথের সঙ্গে একেকদিন ঠাকুর নিজে মাটি দিযেছেন। এগুলি ভেঙ্গে পাকা কববার কি দরকার ছিল? নতুন করে মাটি দিযে শক্ত পোক্ত করে চালটা বদলালেই হত।' রাগ করে নতুন পাকা ঘরে গেলেন না তিনি। পঞ্চবটীর পুরানো ঘরেই বাস করতে লাগলেন। ১৩৩৯ সালে সদলবলে মঠ পরিদর্শনে এসে ঠাকুর নিজে যখন তাঁর নতুন ঘরে বাস করতে লাগলেন, তখন মঠের মাও তাঁর নতুন ঘরে এলেন। ঘর ও বারান্দা বড় করার জন্য প্রজ্ঞানন্দজী ঠাকুর ঘরের সামনেব ও বাদিকের বাগান নষ্ট করে ফেলেছিলেন সেও ভৈরবী মায়ের কম মনঃক্ষোভের কারণ হয়নি।

১৩৩৯ সালে আমাদেরও পুরী হ'তে ঠাকুর কৃপা করে মঠে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই আমাদের সংঘ-জননী যোগমায়াদেবীর অপার বাৎসল্যের পরিচয় আমিও পেয়েছি। দেখেছি ঠাকুরের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ। বেশ কিছুদিন আগেই ভৈরবী মায়ের দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। চোখে ভাল দেখতে পান না আর। তাই নিজে পাক করে ঠাকুরকে খাওয়াতে পারেন না বছর দুই হল। সেবক নলিনী (অদ্বৈতানন্দ সরস্বতী)-কে হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন চিড়া মুড়ি ভাজা, খই ভাজা,

নাড়ু করা, ঘি তৈরী করা, নানারকম খাবার ও তরকারী রান্নার প্রণালী। ঠাকুর মঠে যাওয়ার পর নলিনীদাকে নিত্য বলে দিতেন সেদিন কি কি রান্না হবে ; কিভাবে কোনটা রান্না করলে ঠাকুরের খেতে ভাল লাগবে। তারপর ভোগে বসিয়ে নিজে সামনে থেকে কেবল খোঁজ করেন 'শুক্তোটা ভাল হয়েছে ঠাকুর ? শাকটা নলিনী ঠিক রাঁধতে পেরেছে ? ইচরের ডালনাটা ?' কি তাঁর কষ্ট। নিজে তো রান্না করতেই পারলেন না, চোখে যে একটু দেখবেন ঠাকুর কি খেলেন না খেলেন সে পথও বন্ধ। নিজে পরিবেশন করতে গিয়ে পাতে বেশী তুলে দেবেন তাও তো পারেন না। নিরুপায় ক্ষোভে তাই বারবার বলেন 'ও স্থর! ওরে সরযু! ঠাকুর কি খাচ্ছেন দেখনারে! এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল ? কিছুই ভাল খেলেন না বুঝি, তাই সবই পাতে পড়ে রইল।' ভৈরবী মায়ের সে ব্যাকুলতায় এতই আন্তরিকতা যে অবাক হযে দেখতাম তাঁর অনুরোধে যা খেয়ে গেছেন তারই কিছু কিছু আবারও নিয়ে হয়তো দুটি অন্ন গ্রহণ করতেন ঠাকুর। শেষে বলতেন, 'যোগমায়া আর পারব না। তুমি সরযুদের জিজ্ঞাসা করে দেখ—পুরীতে আমি এর অর্দ্ধেক খাই।' সরযুমা ও স্থরমা তাঁর কথা সমর্থন করলে তবে ভৈরবী মায়ের মন নিশ্চিন্ত হত। তখন নিশ্বাস ফেলে বলতেন, 'নিজে রেধে তো আর দিতে পারি না। তাই জোর করতেও পারি না বেশী, নলিনী কেমন রাধে সে কি আর জানি না! ঠাকুরের ভাল লাগবে কেন ? তবুও যে এটা খান ওটা খান করি, ওটা অভ্যাস। তাছাড়া বলে না খাওয়ালে যে উনি কিছুই খাবেন না। অন্যমনস্ক হয়ে আধ্‌পেটা খেয়েই উঠে যাবেন সে তো জানিস্।' এটা যে অত্যুক্তি নয়, কুটীরের মায়েরা কেন শ্রীশ্রীঠাকুরও বেশ জানতেন। তাই যোগমায়াদেবীর এই স্নেহের দাবী মেনে নিয়ে আহারে মনোযোগী হতে চেষ্টা করতেন। তবু ভৈরবী মায়ের প্রাণ তৃপ্ত হত না। কেবলই মন কাঁদত, হায়! যদি নিজে দুদিন রান্না করে খাওয়াতেই না পারলাম তবে এমন ভাবে বেঁচে থেকে আমার কি লাভ ?

তবু তো বেঁচে থাকতে হয়। মহারুদ্র প্রদত্ত সন্ন্যাস ব্রতের সাধনা যে কি কঠোর, উত্তর-কালের মেয়েদের সে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই বুঝি ঠাকুর মঠ ত্যাগের পর তের বৎসর এবং মহাসমাধি গ্রহণের পরও ছয় বৎসর—এই সুদীর্ঘ উনিশ বৎসর মঠের মাঝে মরুদগ্ধ প্রাণে শূন্য মনে জীবিত থাকতে হয়েছিল। ১৩৩৯ সালে সেবার ঠাকুর যখন মঠ হতে বিদায় নেওয়ার জন্য পা বাড়ালেন, তখন মঠে সকলের পূজনীয়া বৃদ্ধা ভৈরবী মায়ের সেই বালিকার মত আকুল রোদন কালের দুস্তর ব্যবধান দূর করে আজও আমার কানে বাজে, মানশ্চক্ষে ফুটে ওঠে। ঠাকুর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কেঁদো না যোগমায়া, আবার দুদিন পরেই তো আসব।' মাথা নেড়ে ডুকরিয়ে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধা যোগমায়া দেবী, 'না গো আর আপনি আসবেন না ঠাকুর! আর বুঝি আপনাকে আমি দেখতে পাব না!' চোখে তো আর দেখতে পেতেন না তখন, কিন্তু ঠাকুর এসেছেন, ঠাকুর মঠে আছেন -ভৈরবী মায়ের কাছে এইটাই তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন। ওই ছিল তাঁর সুখ, তাঁর আনন্দ।

সেই ভৈরবী মা আমাদের! তিলেক ঠাকুর অদর্শন যাঁর এক যুগ মনে হত—অপ্রাকৃত দিব্যধামের সকল ঐশ্বর্য যাঁকে ঠাকুর ভোলাতে পারেনি, সেই যোগমায়া দেবীকে দুস্তর শোক পারাবারে ভাসিয়ে ১৩৪২ সালেই ১৩ই অগ্রহায়ণ ঠাকুর মহারাজ কলকাতায় মহাসমাধি গ্রহণ করলেন। অস্তাচলে লয় হলেন সারস্বত সংঘের জ্ঞান ভাস্কর। হায়! যাওয়ার আগে ভৈরবী মাকে একবার আভাসেও জানালেন না—'যোগমায়া আমি চললাম।'

ঠিক যেন পাণ্ডব সখা শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ। অন্যেরা দূরে থাক, সম্পদে বিপদে শ্রীকৃষ্ণ-সর্ব্বস্ব পঞ্চপাণ্ডবকেও তিনি একবার বলেন নি, 'ভাই সব আমি এবার চলে যাচ্ছি।' মহামুনি ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণহারা অর্জ্জুনের সেই মর্ম্ম ছেঁড়া কাতর বিলাপ লিপিবদ্ধ করে গেছেন ভাবীকালের জন্য। লজ্জা, মান, পৌরুষ, গর্ব সব ভুলে সর্ব্বহারার মত মহাবীর সব্যসাচী আর্ত হাহাকারে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছেন যুধিষ্ঠিরের পায়ের কাছে।

নিদারুণ শোকে স্তব্ধ ধর্ম্মরাজ পাষাণ মূর্ত্তির মত বসে আছেন সিংহাসনে, হাতের রাজদণ্ড শিথিল হয়ে খসে পড়েছে মাটিতে। অভাবিত সে দুঃসংবাদে দ্রৌপদীর যে কি হয়েছিল ব্যাসদেব তা লেখা প্রয়োজনই মনে করেননি। গোবিন্দকে যিনি জীবনের একমাত্র বান্ধব জ্ঞান করতেন তাঁর চির-বিচ্ছেদ পাঞ্চালির কাছে কতখানি দুঃসহ, ভাষায় তা বোঝান যায় না। ভীম আর নকুল সহদেব বুঝি জরাগ্রস্ত অথর্ব্বের মত শিথিল দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন, চোখে জল আসেনি মুখে ভাষা ফোটেনি। মুহূর্ত্তে সংসার শূন্য বোধ হয়েছিল, খসে গিয়েছিল ভবপাশ। ব্যাসদেব সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন। বেশী কথা বলেননি তিনি। কেবল জানিয়েছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ নাই' অর্জ্জুনের মুখে এই কথা শোনামাত্র পরীক্ষিৎকে রাজদণ্ড দিয়ে উন্মত্তের মত মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণ শূন্য ভারত-সিংহাসন তাঁর কাছে শুধু স্মৃতির জ্বলন্ত চিতা। সেই সঙ্গে কায়ার পিছনে ছায়ার মত তার সঙ্গ ধরলেন চার ভাই এবং দ্রৌপদী। জীবন মরণে তাঁরা কৃষ্ণময়—শ্রীকৃষ্ণ বিহনে এ সংসারে কোন কর্ত্তব্য নাই তাঁদের, নাই কোন দায়। আছে কেবল কৃষ্ণ ধ্যানে জীবন কাটানোর পরম ব্রত—সন্ন্যাসের সাধনা।

মা ইতিমধ্যে অনন্তদার কাছে শুনেছেন নলিনী ডাক আনতে গেছে। কতবার জানতে চেয়েছেন নলিনী এসেছে কিনা। তার সাড়া পেয়েই মা কাতরস্বরে বলেন, 'চিঠি এলরে? 'না মা কোন চিঠি আসেনি' বলে নলিনীদা তাড়াতাড়ি মায়ের খাওয়ার আয়োজন করেন। সাধারণতঃ বেলা দশটার মধ্যেই ঠাকুর ভোগ দিয়ে মাকে প্রসাদ দেওয়া হত। মায়ের বেশী বেলায় খাওয়া ডাক্তারের নিষেধ ছিল। প্রসাদ আনতেই মা বললেন, 'আমি খেতে পারব না। আজও ঠাকুরের খবর পেলাম না। ঠাকুর কি চলেই গেলেন?' ফকিরদা, কৃষ্ণদাকে যোগমায়া দেবী খুব স্নেহ করতেন। তাঁরা আজ মায়ের প্রসাদ পাবেন বলেই সব এসেছেন বলায়, অনিচ্ছাতে আসনে বসলেন মা। কিন্তু খেতে গিয়ে একগ্রাসও খেতে পারলেন না, মুখ থেকে ফেলে দিলেন

অন্নগ্রাস। বললেন, 'বুকটা কেমন করছে, পারলামনারে'। চুমুক দিয়ে খানিকটা দুধ খেলেন। নলিনীদা তার হাত মুখ ধোওয়ার জল দিয়ে পান তৈরী করছেন। এমন সময় মায়ের নিত্য চিকিৎসক ডাঃ বিনোদ বাবুকে নিয়ে বসন্তদা এসে পড়লেন। মা পান খাচ্ছেন, তাঁকে ঘিরে বসেছেন কর্মী সেবকরা, ঠাকুরের কথাই হচ্ছে। সবাই যেন ঠাকুরের সংবাদ পাওয়ার জন্ত ব্যস্ত হয়ে এসে পড়েছেন মঠে।

কথার পিঠে ডাক্তার বলেন, 'মা আপনি সবই জানেন। আমরা আর আপনাকে কি বোঝাব? জগতে কেউ কি চিরদিন থাকে? তবে আপনি ঠাকুরের সংবাদ পাওয়ার জন্ত এত অস্থির হচ্ছেন কেন? তিনি তো বার বার বলেছেন দেহটা গেলেও তাঁর বিনাশ নাই। গুরু নিত্য, অবিনাশী'। ভৈরবীমা আরও উদভ্রান্ত হয়ে পড়েন 'তোরা এসব কি বলছিস? অত তত্ত্বের ধার ধারি না বাপু। নিজের হাতে যাঁকে খাইয়েছি পরিয়েছি তার দেহখান কি আমার কাছে কিছুই নয়? ঠাকুরের খবর তোরা পেয়েছিস? আমায় লুকাচ্ছিস? ঠাকুর কি আর নাই।' তাঁকে চারিদিক হতে বেষ্টন করে আরও ঘনিয়ে আসেন সেবকরা 'মা, একটু শান্ত হও। তুমি এমন করলে আমাদের কে দেখবে। শোন, তোমার অনুমানই সত্য—ঠাকুর কাল আমাদের ছেড়ে নিত্যধামে চলে গেছেন মা।' আর্তনাদ করে উঠলেন যোগমায়া দেবী, 'আমি একটু জানতেও পারলাম না? ঠাকুর আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল? সত্যই ফেলে রেখে গেল চিরদিনের মতন? ও ঠাকুর…' মুখের কথা শেষ হয় না, মা পড়ে যান মাটিতে, সংজ্ঞাহীন নিস্পন্দ শরীর। প্রাণ আছে কি নাই বোঝা যায় না। সভয়ে প্রাণপণে শুশ্রূষা করেন অন্তেবাসীরা।

ভৈরবী মা প্রায় তিনদিন সংজ্ঞাশূন্ত ছিলেন। একেকবার তাঁর জ্ঞান ফিরত, কিছু খাওয়াতে গেলেই মুখ ফিরিয়ে নিতেন, চোখ বেয়ে অসারে জল গড়াত। 'ও ঠাকুর! ঠাকুর গো!' বলতে বলতে মা আবার অজ্ঞান হয়ে যেতেন। তিনদিন মহাশোক ভোগ করে ধীরে ধীরে মা উঠে বসেন।

প্রতীক্ষায় থাকেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূতদেহ আসবে আসাম মঠে, এখানেই তো তাঁকে সমাধি দেওয়ার কথা অন্তেবাসী সকলেই তা জানেন, বহুবার ঠাকুরের মুখে শুনেছেন কোথায় তাঁকে সমাধি দেওয়া হবে। ভৈরবীমা মনে মনে জানেন ওই সমাধিপীঠে আছড়িয়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে আর সেখানকার সেবা পূজা নিয়েই তাঁর বাকী জীবন কাটবে। কিন্তু সে আশাও তাঁর পূর্ণ হল না। খবর এল শ্রীশ্রীঠাকুরকে হালিসহর আশ্রমে সমাধিস্থ করা হয়েছে। চিদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের মরদেহ মঠে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেহ বিকৃত হয়ে উঠছে দেখে অনিচ্ছায় হালিসহরেই সমাধি দিয়েছেন। ব্রহ্মচারী সত্যচৈতন্যজীর কাছে ছাপানো ট্রাষ্টডিড্ ছিল। কিন্তু সেই মহাগোলযোগের মধ্যে কেউ আর ডিড্ খুলে দেখেনি যে ঠাকুরের আদেশ ছিল, কোন বাধার জন্ত যদি দেহ মঠে নেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তা দাহ করে দেহভস্মও মঠেই সমাধি দিতে হবে। ভৈরবীমাও একথা জানতেন না। তাই আর কোন প্রতিবাদ না করেই তপ্তশ্বাস মোচন করে বললেন 'গঙ্গা তীরে বসেছেন ঠাকুর? এখানে এলেন না? আমাকে একবার শেষ প্রণামটাও করতে দিলেন না?' চোখে তো দেখতে পেতেন না, কিন্তু পায়ে হাত দিতেন শেষ বারের মত! মনে জাগত সেই "অতুল রাতুল" পাদ-পদ্ম দুখানি, যা দেখে একদিন অসংবরণীয় চিত্তাবেগে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। জীবনে সেই প্রথম মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছিল যে চরণ দুটি দর্শনে, তাঁর অন্তিম স্পর্শ যে একান্ত কাম্য ছিল তাঁর। অস্থির হয়ে ওঠেন ভৈরবী মা। ঠাকুরের দেহ ত্যাগ কালে তাঁর সন্নিহিত ছিল এমন কোন জিনিষ বা নিত্য ব্যবহার্য্য কিছু ধরতে ছুঁতে চায় তাঁর প্রাণ। মঠের সব যেন মনে হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের কতকাল আগে ফেলে যাওয়া—যোগমায়ার আর মন ভরে না ওসবে। তাঁর কথা মত চিদানন্দ মহারাজকে চিঠি লেখেন সেবক নলিনীদা।

চিদানন্দজী পাঠালেন দেহত্যাগ কালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্নিহিত করঙ্গ, গামছা আর ঘটি। জানালেন অন্ত সব জিনিষ ভ্রমন কালে যা ঠাকুর নিয়ে আসতেন ও পুরীর বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন তা নীলাচল কুটিরে চলে

গেছে। তখন ভৈরবী মায়ের আদেশেই নাকি নলিনীব্রহ্মচারী কুটিরে টেলি-গ্রাম করলেন, 'মা অত্যন্ত কাতর হয়েছেন। তাঁর সান্ত্বনার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘড়ি, কলম ও চশমা ইন্সিওরড পার্শেলে মঠে পাঠাও।' কুটিরের রক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা সুরবালাদেবীর শিক্ষা দীক্ষা সবই আসাম মঠে। বাল্যে ঠাকুরের কাছে ভৈরবীমা সম্বন্ধে তিনি যে সব আদেশ নির্দেশ পেয়েছিলেন তার ফলে ঠাকুরের পরেই যে, মঠের মায়ের স্থান—এ সংস্কার তাঁর মনে দৃঢ় মূল ছিল। সুতরাং যদিও ঠাকুরের আদেশ ছিল নীলাচল কুটিরে, যা কিছু আছে, তাঁর দেহ ত্যাগের পরও তা সেখানেই রক্ষিত হবে—তবু শোকাকুলা ভৈরবী মায়ের আদেশ লংঘন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। নির্ব্বিচারে ভৈরবী মায়ের অনুজ্ঞা পালন করলেন, এবং জিনিষগুলি পাঠিয়ে যোগমায়াদেবীকে জীবনে প্রথম একখানি চিঠি লিখলেন। তার উত্তরে ভৈরবী মাও তাঁর সেবক নলিনীকে দিয়ে একখানি চিঠি লেখালেন। যোগমায়া দেবীর মহাশোকের পঠভূমিকায় এই চিঠিখানি লেখা বলে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ। চিঠিটির নকল নীচে দেওয়া গেল।

জয়গুরু

আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ
পোঃ কোকিলামুখ
যোরহাট (আসাম)
১লা মাঘ। ১৩৪২

স্নেহের সুর।

তোর পত্র পাইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের মহাসমাধি মাসাধিক হইল, তোর নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের বিস্তারিত সংবাদ কিছু পাই নাই। আশা ছিল তুই আমার প্রাণ-মন বুদ্ধি সবই বুঝিতে পারিতেছিস। বড় আশা ছিল কেউ না জানাইলেও তুই জানাইতে ভুলিবি না। তাও এত দিন হইল কিছুই জানালি না দেখিয়া কোথায় কি, কি ভাবে আছে, সবিস্তারিত জানিবার মানসে তোকে ও চিদানন্দকে টেলি করি। শ্রীমান চিদানন্দকে

এই সব জিনিষ আনিবার জন্ত টৈলি করিয়াছি। কোন বিষয় কোথায় কি হইল বা হইবে ট্রাষ্টিরা আমাকে জানায় নাই। তুইও জানাইলি না বা আমার নিকট কোন মতের অপেক্ষা করিলি না। আমার নিজের মন হইতে তোকে জানাইয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের মহাসমাধির পর তাঁহার কোন নিশানা মঠে এযাবৎ না পাওয়ায় বড়ই কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছিলাম। গতকল্য মঠে করঙ্গ, গামছা প্রভৃতি জিনিষ চিদানন্দ পাঠাইল। তোর জিনিষগুলি আসিয়া পৌছিবে জানিলাম। যাক সকলে আমার মঙ্গলাশীর্বাদ গ্রহণ করিবা। লীলুকেও আমার স্নেহ শুভাশীর্ব্বাদ দিবা। লীলু কেমন আছে? চিঠিতে কোন কিছু জানাইস্‌নি। লীলুর সংবাদ সত্বর দিবা। অন্যথা করিবা না বা ভুলিবা না। তাহার প্রতি সতত স্নেহ দৃষ্টি রাখিবা। সতত যত্ন করিবা। সে যেন কোন প্রকার মনে প্রাণে কষ্ট না পায়। সত্বর পত্রের উত্তর দিও। মাঝে মাঝে সংবাদ দিতে ভুলিস্‌ না॥

দেখ সুর, তুই আমার কাছে এখনও যেন সেই ছোট্ট বালিকাটি। দেখ, সদাসর্ব্বদা ঠাকুরকে বুকে রাখিয়া তাঁহার গরবে গরবিনী থাকিবা, তাঁহারি ধ্যানে সতত নিরত থাকিয়া অন্য কোন দিকে মন দিবা না। সত্য ও ন্যায পথে পবিত্র থাকিয়া অনুক্ষণ ধ্যান পরায়ণ হইয়া নিরলসভাবে তাঁহারি কর্ম করিয়া যাইবা। আর আমি কি উপদেশ দিব? আমার রোগজীর্ণ দেহ লইয়া আমি বা আর কয় দিন? শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম রাখিবি। শ্রীমান নলিনী প্রভৃতি মঠের ছেলেরা সকলে এক রকম আছে।

ইতি—

তোদের শুভানুধ্যায়ী—মা।

চিঠিখানি ভৈরবী মায়ের স্বহস্তলিখিত না হলেও তাঁর কথা মতেই যে লেখা তা এর ভাষা ও ভাবেই ধরা পড়ে। চিঠির প্রতিছত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ত যোগমায়াদেবীর গভীর ব্যাকুলতা ও গুরুভক্তির পরিচয় মেলে। "সর্বদা ঠাকুরের ধ্যানে তন্ময় থেকে নিরলস চিত্তে তাঁরই কর্ম করে যাও"—এ উপদেশ তাঁর মুখেই তো মানায়! যে-শিক্ষা নিজে পেয়েছিলেন

ভৈরবীমা তাঁর মেয়েদের সেই শিক্ষাতেই দীক্ষিতা করতেন চাইতেন। অন্য কিছু তিনি জানেন না।

সম্মিলনী অন্তে নব-নির্ব্বাচিত মহান্তরূপে চিদানন্দ মহারাজ মঠে ফিরে সবিস্তারে মঠের মাকে সব ঘটনা জানালেন। সেবক সঙ্ঘের সম্মিলিত আপত্তিতে শ্রীশ্রীঠাকুর-নির্ব্বাচিত মহান্ত প্রজ্ঞানন্দজী পদত্যাগ করে চলে গেছেন শুনে মা নাকি নলিনীদার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রজ্ঞানন্দজীর সঙ্গে কোন দিন তাঁর আলাপ-পরিচয় বেশী না থাকলেও তিনি জানতেন মানুষটি বড় তেজস্বী ও কর্ম্মক্ষম। সবচেয়ে বড় কথা, ঠাকুর মহারাজের নির্ব্বাচিত মহান্ত যিনি, তাঁর চলে যাওয়াটা মঠাশ্রমের পক্ষে শুভলক্ষণ নয়—এই-ই যোগমায়াদেবীর মনে হল। তারপর যখন চিদানন্দজীর কাছে শুনলেন হালিসহরে ঠাকুরের সমাধি হওয়ার কথা নয়—উপায়ন্তর না থাকলে দেহ ভস্মীভূত করে হলেও দেহাবশেষ মঠেই আনার কথা—ভৈরবীমা আর নীরব থাকতে পারলেন না। গর্জে উঠে বললেন, "তারপরও ঠাকুরকে তুই মঠে আনতে পারলি না চিদানন্দ? হালিসহরে রেখে এলি তাঁকে? একবার আমার মতটাও নিলি না?' যোগমায়াদেবীর সরোষ উত্তেজনার ছোঁয়া শান্ত নিরীহ স্বভাব চিদানন্দজীর মনেও লাগে।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুরের কি নির্দ্দেশ ট্রাষ্টডিডে ছিল তা পড়েই আমি ট্রাষ্ট মিটিঙে বলেছিলাম মা। বললাম তাহলে সমাধি তুলে তাঁর দেহ দাহ করে আমরা ভস্মাবশেষ মঠে নিয়ে যাই। কিন্তু মা ভক্তরা খুব আপত্তি তুলতে লাগল, কারও মত নাই···'। তাঁর কথা শেষ না হতেই ভৈরবী মা আবার রুষ্ট-স্বরে বললেন, 'ভক্তদের কথা বড়, না, ঠাকুরের আদেশ বড় চিদানন্দ? এতদিন আমাদের কাছে তবে কি শিখলি তুই? এতটুকু বয়স হতে কি শুনলি? আমি সোজা বলছি ঠাকুরকে যদি মঠে আনতে না পারিস তবে তুই আমার ছেলে নস্। আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর আজ হতে তুই ঠাকুরের দেহ মঠে সমাধিস্থ করার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করবি? তা যদি না করিস, তোর মুখ দর্শন করব না আমি।' চিদানন্দজী মায়ের পাদস্পর্শ

করে শপথ করেন- 'আমি নিশ্চয় প্রাণপণ করব ঠাকুরকে আনার জন্ত।' সেই সঙ্গে বললেন 'তুমি কিন্তু নিজ মতে অটল থেক মা, তুমি যেন বিরূপ হয়ো না।' সমাধি উত্তোলন আন্দোলনের মূলে ছিল ভৈরবী মায়ের এই আদেশটি।

মঠের আভ্যন্তরীন গোলযোগে যোগমায়া দেবী বিরক্ত হয়ে একবার নিজেই পুরী চলে যেতে চেয়েছিলেন সেকথা আগেই বলেছি। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর জানতেন ওটা তাঁর মুখের কথা। এরপর ভৈরবীমা যখন সত্যই জরাজীর্ণা ও রোগগ্রস্তা হযে ক্রমে দৃষ্টিশক্তি একেবারে হারালেন, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে একবার তাঁকে পুরী নীলাচল কুটীরে এসে থাকতে বলেন। তখন মঠের মা নাকি তাঁকে বলেছিলেন- 'ঠাকুর এই মঠ আপনার হাতে গড়া। চোখের সামনে একটু একটু করে জলাজঙ্গল হতে কেমন করে এই সোনার মঠ আপনি নিজে গড়ে তুললেন আমার চেয়ে কে তা বেশী জানে? এর সর্ব্বত্র আপনার স্মৃতি জড়ানো। তাই মঠ ছেড়ে কোথাও যেতে আমার প্রাণ চায় না।' এ হতে কেউ যদি ভাবেন মঠের মায়ের কোকিলামুখ মঠের প্রতি বড আসক্তি ছিল—তিনি ভুল করবেন। তাঁর সেই আসক্তির মূলে ছিল তাঁর ঠাকুরের প্রতি অনুরক্তি। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং লিখেছিলেন 'এই মঠ আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। মঠের কাছে আমার প্রাণটা তুচ্ছ।' ঠাকুরের এই মঠপ্রীতিই যোগমায়া দেবীর চিত্তে সঞ্চারিত হয়েছিল।

পরবর্ত্তীকালে সঙ্ঘে, আশ্রমগুলিতে নানা বিপর্যয় দেখে এবং আরও বহু কারণে শ্রীশ্রীঠাকুর আসাম মঠ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বিরূপ মন্তব্য করলেও তার অর্থ এই নয় যে আসাম মঠ আর ঠাকুরের প্রিয় ছিল না। তাই যদি হত, তাহলে তাঁর অর্পণ নামা বা ট্রাষ্টডিডে তিনি মঠকেই আশ্রমগুলির কেন্দ্র ও মঠাধ্যক্ষকেই সেবক সঙ্ঘের পরিচালক বলে নির্দ্দেশ দেবেন কেন? সুতরাং ভৈরবী মা যে ট্রাষ্টডিডের সর্তানুযায়ী ঠাকুরের হালিসহরস্থ সমাধিকে অস্বীকার করেই দেহাবশেষ মঠে আনতে বললেন এও তাঁর সুদৃঢ় গুরু নিষ্ঠারই পরিচায়ক। কিন্তু 'কাল বলবান।' যে অশুভ শক্তির চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাবশেষ কোন মতেই আসাম মঠে আনা গেলনা এবং হালিসহরেই গড়ে উঠল সমাধিমন্দির, সেই অশুভশক্তির অপকৌশলেই ভৈরবীমা অবশেষে ১৩৪৪ সালে আসাম মঠ ছেড়ে বাংলায় আসতে বাধ্য হলেন। ঠাকুর মহারাজ বিদেহী হওয়ার দুইবৎসরের মধ্যেই মঠাশ্রমে ঘোর বিপ্লব দেখা দিল। যিনি ছিলেন মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শয়তানের ষড়যন্ত্রে তাঁকে সরকারী আদালতের আসামী হতে হয়েছিল। এ বিষয়ে একটা কথা, মনে রাখাই যথেষ্ট যে ভৈরবীমা তখন অতি বৃদ্ধা, অন্ধ এবং সর্বকর্মে প্রায় অশক্ত। তাঁকে কর্তৃপক্ষ নিজেদের ইচ্ছামত খেলার ঘুঁটি করে ভাগ্যের পাশা খেলছেন। ভৈরবী মায়ের চোখের জল ফেলা ও ঠাকুরকে ডাকা ছাড়া আর কোন সম্বল ছিল না, কোন প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ যাঁরা লঙ্ঘন করতে পারেন তাঁরা কেন যোগমায়া দেবীর মতামতে কর্ণপাত করবেন? সুতরাং যা কিছু ঘটল, ভৈরবীমা তার ক্রীড়নক মাত্র।

আসাম মঠে ঠাকুরের সমাধি নাই, হালিসহরেই গড়ে উঠেছে মহাসমাধিপীঠ। সেই বিচারে হালিসহরের আশ্রমে বাস করতে ভৈরবী মায়ের কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু একথা ঠিক যে আসাম মঠ বলতে গেলে ভৈরবী মাযের রাজ্যপাট—তাঁর নির্দ্দেশ ও ইচ্ছানুযায়ী মঠের জীবন পরিচালিত হত এক কালে। পরে অতটা প্রভাব না থাকলেও মর্যাদা ছিল। কিন্তু হালিসহর আশ্রমে বস্তুত তিনি আশ্রিতা মাত্র। সেবা যত্নের ত্রুটী হয়ত হয়নি। কিন্তু যোগমায়াদেবীর মনে সুখশান্তি বলে আর কিছু ছিলনা।

১৩৪৬ সালে হালিসহর আশ্রমে ভৈরবী মাকে আমার বড় মাকে, আমরা শেষ দেখলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশানুযায়ী এককালে মঠান্তেবাসীদের কাছে যিনি রাজরাজেশ্বরীর মহিমায় পূজিতা হতেন, সেবার তাঁকে দেখলাম যেন পথের কাঙালিনী। দুঃখদীর্ণা খিন্না সন্ন্যাসিনীর সেই বেদনা করুণ মুখচ্ছবি আজও সুরবালাদেবী ও আমার অন্তরপটে আঁকা আছে।

নিত্যানন্দধামের অপার্থিব ঐশ্বর্য সৌন্দর্য্যভাণ্ডার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়েছে দেখেও একদা যাঁর চিত্তে কেবলই গুঞ্জরিত হয়েছিল 'ঠাকুরতো আসেনি! ঠাকুর যে বসে গেলেন সেখানে'......সেই যোগমায়াদেবীকে তাঁর ঠাকুর চার বছর হল একা ফেলে রেখে চলে গেছেন। কই তিনি তো দিব্য বিগ্রহে একবারও এসে ডাক দিলেন না—'যোগমায়া আর কেঁদনা তুমি! আমি এসেছি তুমি এবার চল আমার সঙ্গে,' এ দুঃখ এ বেদনার কি আর অন্ত আছে?

অর্দ্ধমলিন একখানি গেরুয়া শাড়ী-পরা, ঘাড়টি এক দিকে একটু কাৎ হয়ে আছে। আশ্রমের বারান্দায় দৃষ্টিহীনা-ভৈরবীমা একা আপন মনে বসেছিলেন। অন্ধ নয়নের দৃষ্টি। লক্ষ্যহীন কোন অলখের সন্ধানে তা হারিয়ে গেছে কে জানে। যোগমায়াদেবী যেন কান পেতে অপেক্ষা করছেন কখন তাঁর ডাক আসবে। ঘাড় কাৎ করে বসে থাকার ভঙ্গিটি দেখলে এমনই মনে হয়। আমরা নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছি। ভৈরবীমা আমাদের উপস্থিতি প্রথমে বুঝতে পারেননি। শুনলাম মৃদুনিক্ষিপ্ত শ্বাসে বলে উঠলেন 'গুরুদেব!' 'গুরুদেব!' এবার আমরা এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিযে প্রণাম করতেই ভৈরবীমা বললেন, 'কে রে?' 'মা আমি স্বর। লীলুকে নিয়ে তোমায় প্রণাম করতে এসেছি'। এই বলতেই যোগমায়াদেবী এক হাতে মায়ের হাত ধরে অন্য হাতটি বাড়ালেন, 'কইরে লীলু কই? আয় কাছে আয়'। আশ্রমে বড়দের মধ্যে একা মানুষ হয়ে অল্প বয়সে আমি ছিলাম মুখচোরা আর লাজুক। মঠে গিয়ে আমি ভৈরবী মায়ের সঙ্গে বেশী কথা বলতে পারতাম না। তিনিই জোর করে আমায় কোলে বসিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে কত কি বলতেন। আদর করে ফল মিষ্টি খাওয়াতে চাইতেন। এখন বড় হয়েছি দশম শ্রেণীর ছাত্রী আমি। তবু যদি ভৈরবীমা ওরকম করেন আরও লজ্জা পাই। কিন্তু যোগমায়াদেবীর দেখলাম সেই একই ভাব হাত ধরে টেনে কোলে বসাতে চাইছিলেন, আমি বাধা দিয়ে তাঁর কোলের কাছেই বসে পড়লাম। কোলে বসবে কে?

স্নেহ কম্পিত হাতে আমার গায়ে মাথায় আশীর্ব্বাদের স্পর্শ বুলাতে বুলাতে ভৈরবীমা চোখ মুছতে লাগলেন। তাঁর যে ঠাকুরের কথাই মনে হচ্ছে তা স্পষ্ট বুঝতে পেরে সুরবালাদেবীর চোখও ভিজে ওঠে। আমার গলার কাছটা চাপা কান্নায় ব্যাথা করতে থাকে। মনে ভেসে ওঠে শ্যাম-শোভা-সজ্জিত ফলপুষ্প সমাকীর্ণ তপোবনের মত সুরম্য সুন্দর সেই আসাম মঠ। সেই বাইরের উঠানে চেয়ারে বসে আছে ঠাকুর—একহাতে হুকার নলটি ধরা অন্য হাতে সদ্য ফোটা—শুভ্র সুবৃহৎ হিমচম্পক একটি। তামাকের সুগন্ধে আর ওই শ্বেত সুন্দর ফুলটির সুবাসে বাতাস সুরভি মদির। "প্রসন্ন সদানন্দ সচ্চিৎ স্বরূপ" শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহহাস্যে আলাপরত অন্তেবাসীদের সঙ্গে—কতদিন দেখিনা সেই শ্রীমূর্ত্তি ?

'মনে ভাবি, হায় আরকি কোথাও ফিরে পাব সে জীবন।' স্মৃতির বেদনায় তিনজনই কতক্ষণ অভিভূত হযে ছিলাম মনে নাই। এক সময় ভৈরবীমাই শান্ত হয়ে অন্য কথা তুললেন। জানতে চাইলেন কোথায় কি ভাবে আছি আমরা, কোন খানে পড়ছি, ম্যাট্রিক দিতে আর কত দেরী। এসব শোনা হলে একবার ডাকলেন 'ও নলিনী! ওরে ভূবন! কে আছিস বাবা—এদের একটু প্রসাদ দেনা'। ধারে কাছে তখন কেউ ছিলেন না। ভৈরবীমা একা থাকলে তাঁর কখন কি দরকার হয় সেজন্য একজনকে থাকতে হয়। তখন তো আমরাই আছি। তাই তাঁরা অন্য কাজে গেছেন হয়তো।

সুরবালাদেবী বললেন 'মা তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমরা ভাত খেয়ে এসেছি। ফিরে গিয়ে লীলু একটু জল খাবার খাবে। জানতো ওর কেমন খাওয়া। যাওয়ার সময় একটু প্রসাদ ভূবনের কাছ থেকে চেয়ে নেব।' ভৈরবী মা তাই মেনে নিলেন 'আচ্ছারে তাই ভাল। বুঝতেই তো পারিস, আমার আর কোন ক্ষমতাই নাই…', বলে একটা নিশ্বাস ফেলে ভৈরবীমা চুপ করলেন। সুরবালাদেবীর মনে পড়ে যায় মঠের যোগমায়া দেবীকে। অতবড় বিরাট মঠের যেখানে যা কিছু হত, সবই প্রথমে জমা পড়ত ভৈরবী মায়ের ভাণ্ডারে। তিনি ভাগ করে যাকে যা দিতেন তাকে তাই নিয়েই

খুশী থাকতে হত। মঠের মায়ের বিনানুমতিতে একটুকরা লেবু কেউ নিতে পারত না। আর আজ? এমন সময় হঠাৎ যোগমায়াদেবী ডাকলেন 'সুর'! 'কেন মা?' তাঁর হাত ধরলেন ভৈরবীমা, 'তোর কাছে অনেক অপরাধ করেছিরে। সে সব আর মনে রাখিস না। আমায় ক্ষমা করিস মা'…তাঁর পায়ে হাত রেখে সুরমা বাধা দিযে বলেন, 'তোমার আবার অপরাধ কি মা? কি বলছ?' মাথা নাড়লেন সন্ন্যাসিনী, 'নারে! অপরাধ করেছি বৈকি এতটুকু বয়সে এসেছিলি আমার কাছে? কত বকেছি, কত রাগ করেছি বিনা দোষে। আমার সব মনে আছে সুর।' সুরমা বললেন 'আমার কিছু মনে নাই মা, সত্যি বলছি। ও সব ভেবে কষ্ট পেও না।' তাঁর গায়ে হাত বুলিযে সজল চোখে অস্ফুটে কি যেন বললেন ভৈরবীমা, বোঝা গেল না। আমি দেখে শুনে আড়ষ্ট হযে বসে থাকি। এই কি সেই মঠের মা?

আজ বুঝি, যোগমায়া দেবীর সন্ন্যাস যে সিদ্ধ হয়েছিল এও তার একটা প্রমাণ। মহাজনেরা বলেন জীবের 'অহংকার অভিমান কিছুতে না যায়।' ছোটর কাছেও নিরভিমানে যে আত্মদোষ স্বীকার করতে পারে সেই তো আত্ম উৎসর্গের সাধনায় সিদ্ধ। বিপুল দুঃখের তাপে ভৈরবী মায়ের সব অভিমান ঠাকুর গলিয়ে দিয়েছিলেন, ছিল কেবল রিক্ততার বোধ। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপী-উদ্ধব সংবাদের একটি শ্লোকে ভগবান ব্যাসদেব কৃষ্ণ হারা গোপী চিত্তের অপরূপ আলেখ্য তুলে ধরে জগৎবাসীকে বোঝাতে চেয়েছেন—ভক্তিজাত বৈরাগ্য কি ভাবে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয়। শ্লোকটি এই রকম—

> যদনুচরিত লীলা কর্ণ পীযুষবিপ্রুট।
> সকৃদ্দনবিধুত দ্বন্দ্বধর্মা বিনষ্টাঃ।
> সপদি গৃহকটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা।
> বহব ইহ বিহঙ্গাভিক্ষু চর্য্যাং চরন্তি॥

ভাগবত—১০।৪৭।১৮

কর্ণামৃত তুল্য পুরুষোত্তমের চরিত লীলাখ্যানের কণিকা মাত্র একবার আস্বাদ করতে পারলেই কতজনের ইহ-পরলোকের সব বন্ধন ছুটে যায়। তখন বিযোগ দুঃখকাতর আত্মপরিজনদের পরিত্যাগ করে তারা দীনবেশে পথের ভিখারী হয়ে ভিক্ষু ধর্ম অবলম্বন করে।

আমরা স্বভাবত সুবৃত্তিপরায়ণ, ঐহিক সুখলুব্ধ। ভগবৎপ্রাপ্তিকেও আমরা অনন্ত সৌভাগ্যদায়ক বলে ভাবতেই অভ্যস্ত। কিন্তু তার প্রকৃত লক্ষণ কি তা আমরা জানি না। শ্রীগুরুকৃপা তথা ভগবানকে পাওয়ার যে একটা রংছুট সর্বহারা দিকও আছে, উপরোক্ত শ্লোকটাতে সেই কথাই গুরু বেদব্যাস দেখিয়ে দিয়েছেন। পরমপুরুষ যে বিশেষ করে নিবৃত্তিমার্গের দিশারী এবং সে যে কত বড় সর্বনাশের পথ—এমন করে চোখে আঙুল দিয়ে তা কেবল গোপীরাই দেখাতে পারেন।

আপ্তকাম আত্মারাম সিদ্ধপুরুষদের দেখে ভগবদ্ভক্তজনের আনন্দোজ্জ্বল দিকটাই আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু লক্ষ্যে পৌছবার আগে কি দুর্গম পথে কোন নিরাশার মরু কি দুঃখের সমুদ্র যে তাঁরা পাড়ি দিয়েছেন—সে হিসাব আমাদের মনে উঠে না। সাধনার সেই বৈরাগ্য ধূসর বন্ধুর পথের চিত্র ভাগবতের গোপীবাক্যে ফুটে উঠেছে।

শাস্ত্রীয় পরিভাষায় সন্ন্যাসি সম্প্রদায়ের নাম "বিহঙ্গ"—মর্ত্যবাসী হয়েও পাখা মেলে অমৃতলোকের সন্ধানে উড়ে চলেছেন তাঁরা। তাই তাঁরা পক্ষীজাতি বা "বিহঙ্গ"। ঘরের কোণে সংসার ধর্ম পালন করে কুলের কুলবধূ হলেও, গোপীরাও সন্ন্যাসিনী। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র অনুধ্যান করে লীলারস-লুব্ধ হয়ে দুর্গমের অভিসারিকা তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন বৃন্দাবনের পথে। ভৈক্ষ্যচর্য্যধারিণী সন্ন্যাসিনী হওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। পুরুষ তো নন তাঁরা! বিধিসম্মত সন্ন্যাসে অধিকার নাই, ঘর ছাড়ার অনুমতি মিলবে না। গৃহে থেকেই দুষ্কর সাধনায় প্রাণ দিতে হবে—তাই তাঁরা বিহঙ্গ হলেও দীন হীনা অভাগিনী। পাখা নাই তবু পাখা মেলে সুদূরের সন্ধানে উড়ে যাবার দুরাগ্রহে ক্ষান্তি নাই, তাই ঘর ছাড়া সন্ন্যাসিদের মত তারাও "দীন—

নিঃস্ব"। ভক্তির প্রগাঢ়তায় এমনি করে ঘর-সংসার, আত্মীয়স্বজন, সুখ-সম্পদের সব বন্ধন ছুটে যায়। সন্ন্যাসের শাস্ত্রানুযায়ী সাধনা না করেও পরম বৈরাগ্যে সন্ন্যাস সিদ্ধি হয়ে যায়। আমাদের ভৈরবী মায়ের জীবনটিও কি এরই দৃষ্টান্ত নয়?

গুরু-পাদপদ্মে চিত্ত লগ্নহওয়ায় ঘর-সংসার মান-বৈভব ঐহিকের সবই জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন তিনি। সতী স্ত্রী হয়ে নারীর পরমগুরুপদবাচ্য স্বামীকেও তিনি গুরুদ্রোহী বলে ত্যাগ করেছিলেন। তাঁকে হারিয়ে উমাচরণবাবুর যে মহাদুঃখ তাও তিনি গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু যাঁর কৃপা-কর্ষণের জন্য এত করেছিলেন ভৈরবীমা, একটি অপরাধে সেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে মঠে ফেলে রেখে পুরীতে এসে বাস করতে লাগলেন। তারপর কিছুই না জানিয়ে অতর্কিতে একদিন তিরোহিত হলেন মর্ত্যধাম হতে। আসাম মঠে তাঁর সমাধিপীঠ গড়ে উঠলে যোগমায়াদেবী একটু অবলম্বন পেতেন বাকী জীবনটা কাটাবার।—কেবল তাঁকে মহাদুঃখ দেওয়ার জন্যই যেন তাতেও অদৃষ্ট বাদ সাধল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তিরোহিত হওযার পর দীর্ঘ ছয় বৎসর আমাদের ভৈরবীমা দুশ্চর দুঃখের-তপস্যায় তাঁর গুরুদত্ত সন্ন্যাসব্রত উদ্‌যাপন করেছেন। তাঁকে মঠ ছাড়তে হল, মঠের সম্পত্তি লুণ্ঠনের অভিযোগে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হতে হল, দুটি অন্ন-বস্ত্রের জন্য পরের মুখাপেক্ষী হতে হল, থাকতে হল গৃহীর আশ্রয়ে। একবার এক ভক্ত মঠের মাকে দর্শন করতে এসে যে গৃহস্থের ঘরে মা ছিলেন সেইখানেই রাত্রে অতিথি হলেন। রাত্রির আহার সেরে যোগমায়াদেবীর কাছে যেতেই তিনি সস্নেহে জানতে চান, 'খেয়েছিস বাবা?' ভক্তটি অলক্ষ্যে জানালেন খেয়েছেন বটে, তাঁর পেট ভরে নাই—। সোজাসুজি বলেননি, মায়ের প্রশ্নে, 'দুখানা রুটি খেয়েছি' বলতেই আসল ব্যাপারটা মা প্রশ্ন করে জেনে ফেললেন। তারপর সেবক নলিনীকে আদেশ করলেন, 'ওকে আমার ছানাটা দে'। ভক্তটি বা সেবক কারও কোন আপত্তিই মা শুনলেন না। হায়, একদিন যাঁর ভাণ্ডার ছিল অন্নপূর্ণার

ভাণ্ডার—সর্বদাই যা পরিপূর্ণ থাকত ; শেষে তাঁকে নিজের ভাগ হতে অন্যকে খাইয়ে অর্ধাহারে রাত কাটাতে হয়। নানা গোলযোগে ভৈরবীমা মঠ ছাড়ার পর হতে খুব খাওয়ার কষ্ট পেয়েছেন। দেহটা রোগ ও জরায় জীর্ণ, উপবাসে বড় কষ্ট হত। কিন্তু প্রায়ই সে দুঃখ ভোগ করতে হত তাঁকে।

হালিসহর আশ্রমে এসেও যোগমায়া দেবী পূর্ণমাত্রায় সুখ পাননি তা আগেই বলেছি। তবে এটা ঠিক যে, কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর লোভও ছিল না। ভক্ষ্য ভোজ্য শাড়ী, প্রয়োজনীয় অন্য সব কিছু বা মূল্যবান কোন শ্রদ্ধার্ঘ্য—সবই তিনি অনুবর্তীদের বিতরণ করে দিতেন। নিজের জন্য কিছুই সঞ্চয় করতেন না। দিনগত গ্রাসাচ্ছাদনই তাঁর যথেষ্ট। জমা থাকত কেবল প্রণামীর টাকা। সমাধি পীঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মর্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজের যথাসর্বস্ব যোগমায়া দেবী হালিসহর আশ্রম কর্তৃপক্ষের হাতে জমা দিতেন।

মর্মরমূর্ত্তি একদিন প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু দেখে অনেকেই সঙ্কোচে বললেন বিগ্রহটি মোটেই ঠাকুর মহারাজের শ্রীবিগ্রহের অনুরূপ হয়নি। ভৈরবী মায়ের আক্ষেপের অন্ত থাকে না। হায়! ঠাকুর কি তবে মুখ ফিরিয়েই থাকলেন? বড় সাধ ছিল ঠাকুরের অনবদ্য একটি বিগ্রহ এখানে স্থাপিত হবে। তাই নিজের যা কিছু ছিল, সবই উজাড় করে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ভাণ্ডারে সঞ্চয় করেছিলেন। তা কি তবে শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রহণ করলেন না? তাঁর ভুবন সুন্দর মর্মর-মূর্ত্তি বিশ্ববাসী দর্শন করে জানবে কেমন ছিল আমাদের ঠাকুর, এই শেষ আকাঙ্ক্ষাও তাঁর পূর্ণ হল না কেন—এ নিয়ে যোগমায়া দেবীর মনোকষ্টের সীমা ছিল না। যাকে কাছে পেতেন তাকেই জিজ্ঞাসা করতেন, 'হ্যাঁরে ঠাকুরের মূর্ত্তিটি ভাল হয়নি? তাঁর মত হয়নি?' বিরূপ মন্তব্য করেন অধিকাংশ ভক্ত। শেষকালে ভৈরবী মায়ের মর্মব্যথা বুঝেই হয়ত, শ্রীশ্রীঠাকুর হালিসহরে পাঠালেন চির মাতৃভক্ত শ্রীমৎ যোগানন্দজীকে। তিনি নাটমন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করে ভৈরবী মায়ের কাছে আসতেই মা ব্যাকুল হয়ে জানতে চান, 'যোগেন, বিগ্রহ নাকি ভাল হয়নি রে? ঠাকুরের মত নাকি মোটেই হয়নি দেখতে? তুই বল্ বাবা কেমন দেখলি? তুই তো প্রথম থেকেই ঠাকুরকে দেখেছিস।' ঠাকুরের ইচ্ছায় যোগানন্দজী যে কি দেখেছিলেন কে জানে, তিনি বললেন, 'মা! ঠাকুর'

শেষ দিকের বিগ্রহের মত না হলেও, আমরা যখন দেখেছিলাম এই বিগ্রহ তখনকার মতই সুন্দর হয়েছে।'

আনন্দে চোখে জল আসে ভৈরবী মায়ের। যোগানন্দজীর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাবা তুই আমায় বাঁচালি, বড় শান্তি দিলিরে। সবার মুখেই শুনি বিগ্রহটি ঠাকুরের মত হয়নি। নিজে চোখে দেখতে পাই না, তাই ভাল মন্দ কিছুই বুঝতে পারি না।' যোগানন্দজীর কথাটি সম্বল করে ভৈরবী মা আশ্বস্ত হলেন। সে আশ্বাস ঠাকুরেরই দেওয়া তিনি ছাড়া যোগমায়াদেবীর দুঃখ আর কে বুঝবে? আমরা সকলেই কিন্তু এ বিষয়ে এক মত যে হালিসহর আশ্রমের মর্মরমূর্ত্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাচীন বা নবীন কোনও বিগ্রহের সঙ্গেই মেলে না—এমন কি, হঠাৎ দেখলে ওটি যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিগ্রহ চিনতে কষ্ট হয়! সদ্‌গুরু নিগমানন্দ দেবের অনিন্দ্যনীয় দিব্যকান্তি একটুও প্রস্ফুট হয়নি ওই মর্মর.কৃতিতে। কিন্তু যোগমায়া দেবীর সে কথা জানার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাঁর দিন তখন ফুরিয়ে এসেছে।

১৩২৯ সালে ঠাকুর মঠ ত্যাগ করার পর হতেই ভৈরবী মা জরা ও ব্যাধির পীড়নে একেবারে স্থবিরা হয়ে পড়েছিলেন। নানা উপসর্গের পীড়নে দেহযন্ত্র বিকল হতে বিকলতর হতে হতে ১৩৪৮ সালে যোগমায়াদেবী শয্যাশ্রয় করলেন। কোন চিকিৎসাতেই আর সুফল দেখা দিল না। মা আর উঠতে হাঁটতে পারেন না। আহার নাম মাত্র। কেবল প্রচণ্ড ব্যাধির অত্যাচার ভোগ আর অহোরাত্র শ্রীগুরু স্মরণ মননে সন্ন্যাসিনীর জীবন দীপ ক্রমে নিভে আসে।

সে সময়ে অন্তেবাসী জিতেনদা নলিনীদা ও ভুবনদার সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত অনুগত গৃহী ভক্ত হালিসহরের শ্রীঅমূল্য কুমার দাসও ভৈরবী মায়ের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। সকলেই বোঝেন মা আর থাকবেন না, এপার ছেড়ে ওপারের পথে যাত্রা করেছেন তিনি। অমূল্যদার কাছেই ভৈরবী মায়ের অন্তিমকালের বিবরণ সংগ্রহ করেছি।

১৩৪৮ সাল, অগ্রহায়ণ মাস। ছয় বৎসর পূর্বে যে পুণ্য তিথিতে ঠাকুর নিগমানন্দদেব মহাসমাধি মগ্ন হয়েছিলেন সেই তিরোভাব লগ্ন আসতে সাত দিন মাত্র বাকী। আশ্রমায়তন আসন্ন উৎসবের আয়োজনে মুখরিত।

অনবরত ভারে ভারে দ্রব্য সম্ভার আসছে, ছুটাছুটি করছে সকলে। সবারই কাজের তাড়া। কেবল এক প্রান্তের একটি ঘরে মেঝের উপর পাতা বিছানায় শুয়ে ভৈরবীমা কষ্টে শ্বাস মোচন করছেন। একেকবার বড় একটা শ্বাস নিয়েই ক্ষীণ স্বরে বলে উঠছিলেন 'ঠাকুর! গুরুদেব!' পেটটা ফুলে উঠেছে অনেকখানি। চরণামৃত ছাড়া সারা দিন আর কিছুই গ্রহণ করেননি। ক্রমে রাত্রি হল—শ্রান্তদেহে শয্যাশ্রয় করেছেন সকলে। কেবল ভৈরবীমাকে ঘিরে পালা করে রাত্রি জাগছেন নলিনীদারা তিনজন এবং অমূল্যদা। সারারাত্রি যোগমায়াদেবীর বড় কষ্টে কেটেছে, এক নিমেষের জন্যও ঘুমাতে পারেন নি।

ব্রাহ্মমুহূর্ত সমাগত দেখে অন্তেবাসী সেবকেরা প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করতে গেলেন। একা অমূল্যদা রইলেন ভৈরবী মায়ের কাছে। মায়ের অর্দ্ধাচ্ছন্ন অবস্থা, একটু ঘুম আসছে! এমন সময় হঠাৎ, অমূল্যদার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাইলেন ভৈরবী মা, 'বাবা এবার আমি যাই?' অমূল্যদা প্রতি বৎসর মহাষ্টমীতে সাক্ষাৎ জগন্মাতা জ্ঞানে ভৈরবী মায়ের পায়ে জবার অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও যোগমায়াদেবী তাঁর কাছে সাক্ষাৎ মহেশ্বর ও মাহেশ্বরীস্বরূপা। ভৈরবী মায়ের প্রশ্নে বাক্‌ রোধ হয়ে যায় অমূল্যদার। যে কষ্ট মা ভোগ করছেন তা আর চোখে দেখা যায় না। কিন্তু হ্যাঁ, মা তুমি যাও'—এ ও যে মুখে আসছে না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ডাকতে-ডাকতে গুরুনিষ্ঠ অমূল্যদা রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'মা গো ঠাকুর কি তোমাকে নিতে এসেছেন?' মুমূর্ষু সন্ন্যাসিনীর রোগক্লান্ত হৃতশ্রীমুখখানি শান্তি ও স্বস্তির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যেন। ক্ষীণ স্বরে তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁরে, ঠাকুর এসেছেন! তুই বল্‌ অমূল্য, তাহলে এবার যাই আমি?' ঠাকুরগতপ্রাণ অমূল্যদার সব শোক মুহূর্তে চলে যায়। সানন্দে বলে ওঠেন, 'তবে আর কথা কি? ঠাকুর যখন তোমায় নিতে এসেছেন তবে তুমি যাও মা!' পরম শান্তিতে যোগমায়াদেবীর চোখের পাতা দুটি নেমে এল। সেবকরা স্নানাদি সেরে এসে দেখলেন চোখের জলে ভেসে অমূল্যদা জয়গুরু-নাম-কীর্ত্তন করছেন। সারস্বত সংঘের সংঘ জননী মহানিদ্রায় নিদ্রিতা। বাইরে তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে ধীরে ধীরে। সারা রাত্রি কষ্টের পর মা বুঝি এবার একটু ঘুমিয়েছেন? একটু পরেই সবাই জানল মায়ের এ ঘুম আর ভাঙবে না।

ভৈরবী মায়ের মুখ দিয়ে গুরু ভক্ত সন্তানটির কাছে সারস্বত মঠাধিষ্ঠাত্রী

গুরুশক্তিই কি সেদিন বিদায় চেয়েছিলেন? 'তুই বল অমূল্য, আমি তাহলে এবার যাই' এভাবে বিদায় প্রার্থনা করার আর কি অর্থ থাকতে পারে? সাধন শৌর্য্যে পরমহংস নিগমানন্দদেব যে পরাবিদ্যাকে সারস্বত মঠে আবদ্ধ করেছিলেন—ঠাকুর মহাসমাধি গ্রহণের দুই বৎসর পরেই ভৈরবী মায়ের মাধ্যমে তিনি সারস্বত আশ্রমগুলির মূলকেন্দ্র আসাম মঠ হতে চলে আসতে বাধ্য হলেন। তার চার বৎসর পরেই বিদ্যাশক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠাতা মঠাশ্রমগুলি হতে অন্তর্হিতা হলেন কি? ১৩৪৮ সাল সারস্বত সংঘের ইতিহাসে ঘোর দুর্বৎসর তাতে কোনও সন্দেহ নাই। তারপর হতেই সমগ্র সংঘ যেন গুরুকৃপা হারিয়ে পথভ্রান্ত হয়ে কুটিল কুপথে পাক খেয়ে মরছে।

মাগো, তাই আমরা আজ সমস্বরে তোমায় আবাহন করছি,—তুমি ফিরে এস মা! সদ্‌গুরুর মন্ত্রবাণী আবৃত্তি করে ডাকছি, 'এস জননী! প্রকাশিত হও, একবার প্রত্যক্ষ করি……' 'তিলেক লাগিয়া হৃদয়ে বসিয়া হাসিয়া কথাটি কও।'

দেবী প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য ॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী

শরণাগতের আর্তিহারিণী হে মাহেশ্বরী, তুমি প্রসন্না হও। নিখিল জগতের জননী তুমি! বিশ্বেশ্বরী! বিশ্বকে তুমি পরিত্রাণ কর। চরাচরের একমাত্র অধিশ্বরী যে তুমিই মা!

তুমি সুপ্রসন্না না হলে শ্রীগুরুর কৃপা কেমন করে আকর্ষণ করব আমরা? তুমি মুক্তি মার্গ বদ্ধ করে রাখলে কি করে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্নিহিত হব? তোমারই অনুগ্রহে আত্মনিমগ্ন পরম বৈরাগী সদাশিবকে কাছে পেয়েছিলাম। তুমিই আবার তাঁকে আমাদের প্রতি অনুকূল করে দাও মা!

জাগো গো মা মহামায়া! জাগাও জগদীশ্বরে।
মোহ মধু কৈটভরে ত্বরিতে বিনাশ তরে ॥

ভৈরবী মাকে শ্রীশ্রীঠাকুর যে যোগমায়াস্বরূপ অভিধা দিয়েছিলেন, এই মর্মার্থ যিনি বুঝবেন তিনিই গুরুপ্রাণা সংঘ জননী মা যোগমায়াদেবীকে ভূলুণ্ঠিত প্রণামে জানাবেন বন্দনা।

এই স্বরূপ পরিচয়েই শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দদেবের প্রথম সন্ন্যাস দীক্ষিতা হেমলতার উদ্বর্তন। গুরুতে সর্বস্ব সমর্পণের মধ্য দিয়ে সমর্পণের সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভ। এই সিদ্ধ সাধিকাই মঠে গুরুর আবারিকা শক্তি—যোগমায়া।

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী দেব প্রণীত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও পত্রাবলী

যোগীগুরু

তান্ত্রিকগুরু

জ্ঞানীগুরু

প্রেমিকগুরু

ব্রহ্মচর্য-সাধন

বেদান্ত বিবেক

ঠাকুরের চিঠি

তত্ত্বমালা

নারায়ণীদেবী অনুদিত ও প্রণীত গ্রন্থাবলী

ঈশানুস্মরণে

ভগিনীনিবেদিতা

বাংলার সাধনা ও শ্রীনিগমানন্দদেব

নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ

নীলাচল বাণী

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ জীবন প্রসঙ্গ

পিলাক্ষ নিগমানন্দ

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে

সদ্গুরু বা গুরুবাদ প্রসঙ্গ

ভাগবতী তনু নিগমানন্দ